কথানিবন্ধ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
প্রণীত।

১৩১২ সন।

মূল্য ১ এক টাকা।

কুন্তলীন প্রেস,

৫ শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ;

ও

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ মজুমদার লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে 'কথা ও রাগি' মুদ্রিত করিয়াছিলাম। উহার কথা অংশ, এই নূতন রচিত কথানিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিলাম, 'রাথি', অন্যান্য নূতন নাট্যরচনার সহিত স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থের পদ্য অংশেও 'সুনন্দা'টি নূতন সংযুক্ত হইল।

সূচী।

কথানিবন্ধ।

কল্যাণী।

[খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে শকদিগের একটি শাখা সৌরাষ্ট্র, গুজরাত প্রভৃতি প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করেন। অন্যান্য ভারতাগত বিদেশীয়দিগের মত ইহাঁরাও প্রথমতঃ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, এবং পরে কুলীন ক্ষত্রিয় বলিয়া সম্পূর্ণরূপে এদেশের লোক হইয়া গিয়াছিলেন। ইহাঁরা ক্ষত্রপ বংশ বলিয়া বিখ্যাত। সম্ভবতঃ ১১৯ খৃষ্টাব্দে চষ্টণ, মহাক্ষত্রপ উপাধি লইয়া প্রথমতঃ স্বতন্ত্র, রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অন্ধ্র বংশীয় রাজারা এই সময়ে এদেশে খুব প্রবলপ্রতাপান্বিত ছিলেন; ইহাঁরা মূলতঃ অনার্য্য। সম্ভবতঃ চষ্টণের প্রতিনিধি নহপানের জামাতা উষবদাত বা ঋষভদত্ত, মালয়দিগকে পরাভূত করেন। সুবিখ্যাত অন্ধ্র রাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণীর সঙ্গেও ইহাঁদের যুদ্ধ হইয়াছিল। চষ্টণ, মালব জয় করিয়া ১৩০ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। জুনাগড় লিপি হইতে জানা যায় যে, চষ্টণের পৌত্র জয়দামনের পুত্র রুদ্রদামন, বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানটি জয়দামনের রাজত্বকালের কথা লইয়া রচিত।]

প্রথম অধ্যায়।

মনোমোহিনী।

অন্ধ্ররাজা গোতমীপুত্র এবং পুলুমায়ি, জয়দামনকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। জয়দামনের ইচ্ছা ছিল, যে তিনি অন্ধ্রদিগের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করিবেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র, রুদ্রদামন, যৌধেয়দিগকে পরাভূত করিয়া যখন দক্ষিণ প্রদেশ জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন প্রায় তিন মাস তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই বলিয়া, সমর বিষয়ে তিনি বড় উৎসাহী ছিলেন না।

তখন ত আর রেল টেলিগ্রাফ ছিল না; রুদ্রদামন যোগবলের চেষ্টাও করেন নাই; কাজেই সর্ব্বদা পিতাকে সংবাদ দেওয়া সহজ হয় নাই। তিনি কেবল রাজ্য জয় করিবার অভিলাষে একেবারে সমুদ্রকূল দিয়া মালবারদেশের সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এত দূর দেশ হইতে কি সংবাদ যায়? তাহার উপর আর একটা গোলযোগও বাধিয়া গিয়াছিল। ইতিহাস ফেলিয়া সেই কথাটাই বলি।

রুদ্রদামন একটু কাব্যপ্রিয় ছিলেন; সমর-শিবিরে বসিয়াও নাকি কখনো কখনো কবিতা লিখিতেন। বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র; ও বয়সে প্রায় সকলেই কবিতা লেখে। মালবার উপকূলে প্রকৃতি ঠাকুরাণী বড় রূপবতী। একদিকে পাহাড়; অন্য দিকে সমুদ্র। যুবরাজ প্রায়ই ঐ প্রদেশে সন্ধ্যার সময় একাকী বেড়াইতেন; একদিন কিন্তু তাহাতে বড় গোলযোগ হইল। একালে কেরল যুবতীরা বড় সুন্দরী। গায়ের রং তেমন ফর্সা নয় বটে, কিন্তু অমন অলকদামের শোভা, অমন চোখের চাহনি, অমন সুঠাম কান্তি সহসা দেখিতে পাওয়া যায় না। গোলযোগটা কিন্তু কেরল যুবতী লইয়া নয়। কারণ সেকালের কেরল দেশের রমণীরা একালের মত সুন্দরী ছিলেন না। কৃষ্ণত্বক্‌পূর্ণ দেশের মধ্যে যুবরাজ একদিন অপরাহ্নকালে একটি ফুটফুটে সুন্দরী দেখিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যাদুমন্ত্রেই হউক, বয়সের দোষেই হউক অথবা

কবিতার দোষেই হউক, সুন্দরীকে দেখিবামাত্রই যুবরাজের যৌবনকুঞ্জ মুখরিত করিয়া যেন একশ কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

যুবরাজের মনোমোহিনী, একটি নারিকেলের মালায় করিয়া পাহাড়ের ঝরণা হইতে জল তুলিয়া কলসীতে পূরিতেছিলেন। ঝরণার উপর সূর্য্যের আলোক পড়িয়াছিল, এবং সে আলোক, নবকুসুমিত যৌবনের প্রভা-প্রদীপ্ত মুখ এবং বক্ষের উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। অন্য কেহ হইলে আছাড় খাইয়া পড়িত; কিন্তু সমরজয়ী যুবরাজ ধীরে ধীরে সুন্দরীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, এই "কালো-দেশে" এত সুন্দর কোথা হইতে আসিল। তিনি যে ঠিক ঐ বিষয়ের প্রত্নতত্ব উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নয়; তবুও একটুখানি ঐ কথা ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইলেন।

যুবরাজের প্রত্নতত্ত্বের প্রয়োজন নাই থাকুক, আমরা কিন্তু পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, ৬৮ খৃষ্টাব্দে পেলেষ্টিন হইতে দশহাজার য়ীহুদী আসিয়া এই উপকূলে বসবাস করিয়াছিল। প্রায় একশত বৎসরে তাহাদের ভাষা ও আচার ভারতবর্ষীয় হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রেম সম্ভাষণ।

যুবরাজ ধীরে ধীরে সুন্দরীর কাছে ঘনাইয়া গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং খুব নরম সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে সকলেই কি ঝরণার জলখায়? সুন্দরী, প্রশ্নকর্ত্তাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন, এবং হাসিয়া বলিলেন,

"পিপাসা হয়েছে কি ?" পিপাসা অতিশয় ; রূপের ঝরণায় লাবণ্যের জল তক্ তক্ করিয়া খেলিতেছিল। যুবরাজ কহিলেন, "হাঁ"। সুন্দরী তখন বস্ত্রমধ্য হইতে একটি ছোট পানপাত্র বাহির করিয়া, একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্রে জল ছাঁকিয়া দিলেন। যুবরাজ যদি জলটুকু না খাইয়া মাথায় দিতেন, ভাল হইত। যুবরাজ সুযোগ পাইয়া নানা কথা পাড়িয়া, পাকেচক্রে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তিনি সুন্দরীর রূপমুগ্ধ। সুন্দরীর তখন পরিহাস করিবার প্রবৃত্তিটা জাগিয়া উঠিল ; জল তোলা শেষ হইয়াছিল, তবুও সেই বিজন প্রদেশে হাসিয়া হাসিয়া অপরিচিতের সহিত কথা কহিতেছিলেন। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সুন্দরীর নাম সারা। নামটা বেজায় য়ীহুদী ; তবু যুবরাজ ঐ নামের মিষ্টতা অনুভব করিয়া, জিজ্ঞাসিত না হইয়াও বলিলেন যে তাঁহার নাম রুদ্রদামন।

সারা কহিল, "তা বেশ, প্রয়োজন হয় ত নামটা লইয়া মালা জপ করা যাইবে।" পরিহাস বুঝিয়াও যুবরাজ কহিলেন, তিনি রাজপুত্র, দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। সারা সতের বৎসরের মেয়ে, কিন্তু সাহস খুব। সে কহিল, "মহাশয়, এ পরিচয় পাইয়াও যদি আমি আপনার প্রণয় প্রার্থনা না করি ?" যুবরাজ কহিলেন, "যিনি এমন সুন্দরী, তাঁহার হৃদয় কি কঠিন হইতে পারে ?" সারা উত্তর দিল, "কিন্তু যিনি এমন মধুর বাক্য বলিতে পারেন, তিনি হয় ত চট্ করিয়াই কঠিন হইতে পারেন। আমি যদি মহাশয়ের প্রেমপ্রার্থী না হই, তাহা হইলে, সৈন্য পাঠাইয়া আমাকে লুট করিয়া সেবাদাসী করিতে পারেন। সেই ভয়টা দেখাইবার জন্যই পরিচয় দিতেছিলেন না ?" যুবরাজ ফাঁপরে পড়িলেন ; বলিলেন, "তাহা কি হয় ?" সারা হাসিল ; কলসীটি কক্ষে তুলিয়া বলিল, "তা হবে না

কেন ? দিগ্বিজয় এবং রমণীজয় ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। লুণ্ঠতরাজ করিয়া অবলা রমণী লইলে কাপুরুষতা নাই।" যুবরাজ সাগ্রহে কহিলেন, "সারা, আমি পিশাচ নহি ; আমি তোমার ভক্ত, আমি তোমার দাস।" যুবতী কহিলেন, "তুমি রণজয়ী যুবরাজ রুদ্রদামন।" এই কথা বলিয়াই একবার আকাশের দিকে চাহিয়া সারা গৃহের দিকে গেল। এবং সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রুদ্রদামন শিবিরে ফিরিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিবিরে।

যুবরাজ যখন শিবিরে ফিরিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যেন কেহই মাথা ধরিয়াছে। কাহারো সঙ্গে কথা কহিতেও প্রবৃত্তি হইতেছে না ; একাকী একটু নিভৃতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে নায়ক আসিয়া প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইলেন। নায়ককে বিদায় দেওয়া চলে না ; তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার কথা শুনিতে হইল। নায়ক বলিলেন :—"গুপ্তচরেরা রাজ্য পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ; দেশের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে। কেরল-রাজ যে ভাবে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই রাজ্য আক্রমণ না করিলে চলে না।" যুবরাজ অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া নায়কের কথায় সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন।

নায়ক পুনরপি কহিলেন—"এদেশে যে সকল য়ীহুদী বাস করে, কেরলপতি তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন বলিয়া তাহারা যুদ্ধে আমা-

দের সহায় হইবে। দু'চারি দিনের মধ্যেই কতকগুলি য়ীহুদী যুবক আমাদের সৈন্যদলভুক্ত হইবে, আশা আছে।" যুবরাজ বিস্মিত হইয়া নায়কের প্রশংসা করিলেন। অন্য সময়ে হইলে নিজে য়ীহুদীদিগের সততার পরীক্ষার জন্য ব্যগ্র হইতেন; কিন্তু আজ নায়কের উপর অগাধ বিশ্বাসস্থাপন করিয়া, সম্মতি জানাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। প্রভুর এই বিশ্বাস দেখিয়া নায়ক হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন।

যুবরাজ ভাবিলেন, যদি য়ীহুদীরা তাঁহার পক্ষপাতী, তবে সারা, রণজয়ী যুবরাজ বলিয়া, অবজ্ঞা প্রকাশ করিল কেন? সারা দরিদ্র, এবং তিনি রাজপুত্র; রাজপুত্র কখনো সুন্দরী দরিদ্রাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন না, ঐ শ্লেষের এই কি অর্থ?

সকল সময়ে সকল কথার অর্থবোধ হয় না। যুবরাজ নিভৃতে বসিলেন, কিন্তু মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটু কাব্য আলোচনা করিবেন বলিয়া কবি এবং বয়স্য শ্রীধরকে ডাকিলেন। শ্রীধর, বুদ্ধদেবের মহিমা প্রচারের জন্য এক খানি নূতন কাব্য পালিভাষায় লিখিতেছিলেন; তিনি আগ্রহ সহকারে সেই গ্রন্থ লইয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীধর একটুখানি ভূমিকা করিয়া বলিলেন যে, তিনি প্রথমেই একটা নূতন ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পড়িলেন:—"সুমরতু সতিমা সুগতং বুদ্ধং।" যুবরাজ সুগতের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া ছন্দের নূতনত্ব স্বীকার করিলেন। শ্রীধর নমস্ক্রিয়া টুকু পড়িয়া অতি উৎসাহে সুর করিয়া কবিতা পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু সকল কথা যুবরাজের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। একবার একটি চরণ লক্ষ্য করিলেন; "নত্থি কিঞ্চনং সসৃসভমবধী মজ্‌ঝে।" কবি আপনার খেয়ালে পরম উৎসাহে কাব-

পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু যুবরাজ ভাবিতেছিলেন যে, পৃথিবীর কোন পদার্থেই কি সার নাই? প্রেমও কি অসার এবং অস্থায়ী? শ্রীধরের কবিতা ত শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি মাত্র; তিনি ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রের নামে মনে মনে ভীত হইতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যে, প্রেম শাশ্বত পদার্থ এবং উহার চরিতার্থতাই যথার্থ মনুষ্য-জীবন।

যুবরাজ আপনার মনে চিন্তা করিতেছিলেন; শ্রীধর যুবরাজকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, যে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অভিধর্ম্মের সার বলা হইবে। যুবরাজ কহিলেন যে তাঁহার শরীর অসুস্থবোধ হইতেছিল, তিনি আর শুনিতে পারিবেন না। শ্রীধর বিদায় লইলেন; যুবরাজ একাকী সেখানে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাধা পড়িল।

দেশ জয় করিতে আসিয়া একাকী ভ্রমণ করা উচিত নয়, নায়ক এবং শ্রীধর এই কথা সর্ব্বদাই বলিতেন, কিন্তু রুদ্রদামন কাহারো কথা শুনিতেন না। পূর্ব্বে কেবল অপরাহ্ণে ভ্রমণে বাহির হইতেন, সারার সহিত দেখা হইবার পর প্রভাত-ভ্রমণও আরম্ভ হইল। যেখানে সারাকে দেখিয়াছিলেন, প্রভাতে উঠিয়াই সেখানে গেলেন; দেখিলেন কেবল দুচারিজন বালক অদূরে খেলা করিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলেন, এবং আবার অপরাহ্ণে সেখানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখনো সেখানে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সাহসে ভর করিয়া পল্লীর দিকে অগ্রসর

হইলেন। পল্লী নিস্তব্ধ। অনুসন্ধানে জানিলেন যে, পল্লীর লোক শনিবারে দেবপূজায় ব্যস্ত থাকে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আর্য্য-সমাজে নক্ষত্র এবং তিথি লইয়া দিন গণনা হইত ; গ্রহ লইয়া দিন গণনা প্রচলিত ছিল না। সম্ভবতঃ অল্প সময়ের মধ্যেই বিদেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতায় বার গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। রুদ্রদামন পল্লীর বাহিরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিলেন। সূর্য্যাস্তের সময় তাঁহার যেন মনে হইল যে, সারা একটু দূর দিয়া চলিয়া গেল। একবার বই দেখিলেন না ; মনে করিলেন, ওটা মতি-ভ্রান্তি। উঠিয়া যখন চারিদিকে নিরীক্ষণ করেন, তখন একটি বালক আসিয়া বলিল, আপনি কদাপি এখানে আসিবেন না। রাজকুমার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে বালক অন্তর্হিত হইল। রুদ্রদামন শিবিরে ফিরিলেন।

নির্ভীকতা ভাল, কিন্তু উহারও সময় অসময় বিচার আছে। প্রেমের আকর্ষণে রুদ্রদামন পর দিন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় ছায়াপথ দিয়া পুনরায় একাকী য়ীহুদী পল্লীর দিকে চলিলেন। আজি সশস্ত্র ছিলেন। পিপাসা ছিল না ; তবুও সারা যে ঝরণা হইতে জল লইয়াছিল, সেই ঝরণা হইতে অঞ্জলি পূরিয়া জল তুলিয়া পান করিলেন। রাজাদিগের পক্ষে পাণিপাত্রে জলপান নিষিদ্ধ, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

জল পান করিয়া একটু বসিয়া আছেন, এমন সময় কোথা হইতে যেন ধ্বনিত হইল, "পালাও"। রুদ্রদামন চারিদিক দেখিয়া লইলেন ; কোথাও মনুষ্য নাই। না পালাইলেও সতর্ক হওয়া উচিত মনে করিয়া, সাবধানে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

অল্প সময়ের পরেই একটি গাছের অন্তরালে একজন কৃষ্ণকায় ধনুঃধারীকে লক্ষ্য করিলেন। ধীরে ধীরে তরবারী নিষ্কাষিত করিয়া হাতে ধরিলেন; এবং ধনুর্ধারীকে লক্ষ্যে রাখিয়া, তাহাকে যেন দেখেন নাই বলিয়া ছল করিয়া, যেন অন্য দিকে চাহিয়া, শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত শরটি, পশ্চাদ্ভাগে অসি সঞ্চালন করিয়া প্রতিষেধ করিলেন দেখিয়া, ধনুর্ধারী বিস্মিত হইল। উপরের দিক হইতে আর একটি শর আসিতেছে লক্ষ্য করিয়া সেটিও আকাশে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। বুঝিতে পারিলেন শত্রু চারিদিক হইতে আসিতেছে।

এমন দ্বিপ্রহরে সজাগ বীরপুরুষকে শরবিদ্ধ করা যায় না; কিন্তু শত্রুর চরেরা অলক্ষ্যে বধ করিতে আসিয়াছিল। রুদ্রদামনকে সতর্ক দেখিয়া হয় ত তাহারা নিরস্ত হইল; তিনিও আর প্রেমের খেয়ালে এরূপভাবে বিচরণ করা বন্ধ করিলেন। প্রিয়সন্দর্শনকামনায় বাধা পড়িল।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাধার উপর বাধা।

নায়ক লোকটি সুচতুর; সে নানা কল কৌশল করিয়া কতকগুলি য়ীহুদী যুবককে সৈন্যদলভুক্ত করিয়া লইল। পথ ঘাট চিনিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধার কথা হইল। য়ীহুদী যুবকেরা ছদ্মবেশ ধরিয়া শিবিরে থাকিবে এবং যুদ্ধ করিবে কথা হইল; কারণ তাহা না হইলে ক্ষত্রপের সৈন্য পরাজিত হইয়া গেলে উহাদের নিগ্রহের আর সীমা থাকিবে না। জয়ী হইলেও, পরে যখন জেতাগণ চলিয়া যাইবেন, তখন বিপদ্ হইতে

পারে। নায়ক এবং যুবরাজ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া সৈন্যপরিচালনা করিয়া অগ্রসর হইলেন।

পাঠকগণ জানেন, যে মঙ্গলোর এখন পশ্চিম সাগরের কূলে একটা বন্দর। ঐ মঙ্গলোরের দূরবর্ত্তী বন্তবল নামক স্থানে ক্ষত্রপ এবং কেরল সৈন্যের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কেরলরাজ পরাজিত হইলে রুদ্রদামনের সৈন্য নেত্রবতী নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নদীকূলে জয়পতাকা উড়াইল।

কেরলরাজ তখন সন্ধি করিলেন, এবং সন্ধির প্রথম প্রস্তাবটি রাখিলেন যে, তাঁহার একটি দুহিতাকে রুদ্রদামনের সহিত বিবাহ দিবেন। বিজয়ী রাজাকে কন্যাদান করা প্রাচীনকালের সন্ধির একটা বিশেষ নিয়ম ছিল। রুদ্রদামন জানাইলেন যে, তিনি বিবাহ করিতে আসেন নাই। কেরল রাজকুমারী নিশ্চয়ই রূপসী হইবেন, কিন্তু পত্নীসংগ্রহে তাহার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। সন্ধির অন্যান্য প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া অনেক ধন রত্ন, অশ্ব হস্তী প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন।

যেদিন প্রভাতে পশ্চিম উপকূলপথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন স্থির হইল, তাহার পূর্ব্ব দিন ঠিক সন্ধ্যার সময় মালব হইতে দশজন অশ্বারোহী আসিয়া পৌছিল। রাজা, পুত্রের সংবাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ইহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহারা রাজার অভিমতি জ্ঞাপন করিয়া কহিল যে, তাঁহাকে নৌকাপথে গুজরাত পর্য্যন্ত যাইতে হইবে, কারণ রাজা সেখানে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমুদ্রকূল দিয়া সুসজ্জিত নৌকা আসিতেছে, দু'চারিদিনের মধ্যেই উপস্থিত হইবে। যে সময় পড়িয়াছিল, তাহাতে দক্ষিণ হইতে অনুকূল পবনে উত্তরের দিকে নৌকায় গেলে যে শীঘ্র যাওয়া যায়, রাজা তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

আবার উপকূল দিয়া যাইতে যাইতে একবার সারাকে যদি দেখিতে পান, যুবরাজ সেই আশা পোষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু পিতার আদেশে দ্বিরুক্তি করিবার পথ ছিল না বলিয়া, সমুদ্রজলে সকল আশা বিসর্জ্জন করিতে বসিলেন। যুবরাজ বয়স্য শ্রীধরের একটা পালি কবিতা স্মরণ করিলেন, তাহাতে প্রেমকে "মারস্স পুপ্‌ফ" বলিয়া ঘৃণা করা হইয়াছে। ত্রিপিটকের মধ্যে যেখানে এই মার-নিক্ষিপ্ত পুষ্পপাশ ছিন্ন করিয়া মৃত্যু জয় করার কথা আছে, তাহাও মনে করিলেন। মনে হইল, সে সকলি অসার কথা। কিন্তু মনুষ্যের ভাগ্য যে নিয়তিতাড়িত, এবং অত্যন্ত অসার তাহা স্বীকার করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দৌত্য।

যুবরাজ কতকগুলি সৈন্য লইয়া জলপথে যাত্রা করিবেন, এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া নায়ক স্থলপথে যাইবেন স্থির হইয়া গেল। য়ীহুদীদিগের মধ্যে একজন নায়কের এবং দুইজন যুবরাজের অনুচর হইয়াছিলেন ; তাহারাও অন্যান্য স্বদেশীয় সৈন্যসহ গৃহে ফিরিবে বলিয়া ব্যবস্থা হইল।

সন্ধ্যার পর যুবরাজের একজন য়ীহুদী অনুচর বিদায় লইবার জন্য উপস্থিত হইয়া বলিল :—"যুবরাজ, আপনার অনুগ্রহ এবং সৌজন্য বিস্মৃত হইতে পারিব না। শুনিতেছি পৈঠান রাজার একটি দুহিতার সঙ্গে আপনার বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে ; আমাদের অনেকেরই ইচ্ছা যে

আপনার শুভবিবাহের সময় উপস্থিত থাকিয়া উৎসব সম্ভোগ করি।” সন্ধ্যার অন্ধকারে এই অনুচর, যুবরাজের মুখের মলিনতা লক্ষ্য করিতে পারিল না, কিন্তু স্বরবিকৃতি টুকু অনুভব করিল। যুবরাজ কহিলেনঃ— “এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?” শিবিরের সকলেই এ সংবাদ জানিত, কাজেই অনুচর অনেকের নাম করিল। সত্যসত্যই অন্ধ্র-রাজের সহিত সন্ধির জন্য রাজা ঐ উদ্যোগ করিতেছিলেন। একটু চিন্তা করিয়া রুদ্রদামন অনুচরকে লইয়া শিবিরে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং সেখানে তাহার হস্তে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া কহিলেন “তোমাকে একটি দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিতে হইবে।” অনুচর যুবরাজের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রুদ্রদামন কহিলেন, “তুমি পলিতান গ্রাম চেন?

অনুচর—চিনি বই কি; আমাদের গ্রামের খুব নিকটে।

রুদ্র—সেখানে সারা নামে একটি সুন্দরী বাস করেন।

অনুচর—সুন্দরী? কই, ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না। পল্লীতে পল্লীতে সারা নামের অনেক মেয়ে আছে।

রুদ্রদামন তখন সারার এমন বর্ণনা করিলেন যে, মনে হইল, তিনি তাহাকে আশৈশব দেখিয়া আসিয়াছেন। অনুচর তখন চিনিতে পারিল। রুদ্রদামন কহিলেন, “তাহাকে একখানি চিঠি দিতে হইবে; এবং যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাও আমাকে পাঠাইয়া দিতে হইবে। যত অর্থব্যয় হইবে, তিনি তাহা বহন করিবেন।” অনুচর কহিলঃ “যুবরাজ, তিনি লিখিতে পড়িতে জানেন কি—” যুবরাজের তাহা জানা ছিল না, তিনি আবার চিন্তাকুল হইলেন। অনুচর কহিল, “সংবাদটা মুখে বলা চলে না?”

রুদ্রদামন কহিলেন ঃ—"মুখেই বলিও ; বলিও রণজয়ী রুদ্রদামন, নিয়তির নিকট পরাজিত ; তিনি যদি আশার সংবাদ পান, তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।"

অনুচর কহিলেন ঃ---"যুবরাজ, আপনার গমনের এখন বিলম্ব আছে, আমি কেন সংবাদটা দিয়া উত্তর লইয়া আসি না ?" যুবরাজ কহিলেন—"না। "তুমি জান না যে কত কষ্টে মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। আমি যে কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে জীবন নষ্ট করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য নহে। অশুভ উত্তর পাইবার পর সমুদ্রপথে যাত্রার সময়, নীল জলের সুস্নিগ্ধ আহ্বানে কর্ণপাত না করিয়া থাকিতে পারিব কি না সন্দেহ। এ কথাটাও তাঁহাকে বলিও।" অনুচর দৌত্যে স্বীকৃত হইল। যুবরাজ পুনরপি কহিলেন, "দেখ কাহিন্, (অনুচরের নাম কাহিন্) তুমি আমার জন্য যে কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছ, তাহাতে তোমাকে ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবার প্রয়োজন। য়াহুদীরা কেরলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, একথা কেহই জানে না। তোমার ছদ্মবেশ আবার গ্রহণ করিও, এখন একবার তোমাকে চিনিয়া লইতে দাও।" অনুচর স্বীকৃত হইয়া পার্শ্বের ঘরে গেল ; কেন না সাজ খুলিতে হইলে একটু জলের সাহায্য চাই।

যুবরাজ দেখিলেন যে, কাহিনের সাজ খুলিতে বড় বিলম্ব হইতেছে। নায়কের সঙ্গে অনেক কথার পরামর্শ করিবার সময় উপস্থিত হইল দেখিয়া, ব্যগ্রভাবে কাহিনেব নিকটে গেলেন। সে তখন মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া করতলে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতেছিল। যুবরাজ দেখিলেন, সে সারী।

পরিশিষ্ট।

রুদ্রদামনের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর, দেশের ব্রাহ্মণেরা বলিতে লাগিলেন যে, যুবরাজ নারায়ণের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং সমুদ্র হইতে উঠিয়া স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশোভা করিয়া আসিয়াছেন। সকলেই তাহাতে বিশ্বাস করিল, কেন না এ পৃথিবীর রমণী ত অমন সুন্দরী হয় না। রাজা জয়দামন পুত্র-বধূকে গৃহে লইয়া নূতন নাম রাখিলেন; সারা নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার নাম হইল কল্যাণী।

চপলা।

প্রথম অধ্যায়।

সরস্বতীজলে।

সহসা বন্যা আসিয়া সরস্বতী নদীতে খরস্রোত বহিতেছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা; তখনও গ্রীষ্মকালে সরস্বতীতে জল থাকিত না, কিন্তু বর্ষাকালে এত প্রবলবেগে বন্যা আসিত যে, নাবিকেরাও নৌকা লইয়া যাতায়াত করিতে ভয় পাইত। থানেশ্বরের ছেলে বুড়া, সকল কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া নদীতীরে বসিয়া ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে। সাহসী যুবকেরা সাঁতার কাটিতে জলে নাবিতেছে, বৃদ্ধেরা ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিতেছেন। বালকবালিকারা কূলে কূলে জল ছিটাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সরস্বতীতে বার মাস জল থাকে না বলিয়া কোথাও একখানি বড় নৌকা নাই; কচিৎ এক একখানি ছোট ডোঙ্গা দড়ী দিয়া কূলে বাঁধা ছিল। যেখানে নগরের লোকেরা আনন্দমগ্ন, তাহা হইতে কিছু দূরে দুইটি বালিকা গাছের আড়ালে জলক্রীড়া করিতেছিল। সহসা একটি বালিকা ডোঙ্গায়

উঠিয়া অপরটিকে ডাকিয়া বলিল, "আয় ভাই! মজা করি।" ডোঙ্গাখানি জলে ভাসিয়া দুলিতেছিল; দড়ি টানিয়া একবার কূলে আসা, আর একবার একটুখানি দূরে চলিয়া যাওয়া, এইটুকু সেই বালিকার "মজা।" দ্বিতীয়া ভয় পাইল; সে বলিল, "না ভাই, কি হইতে কি হইবে; আমি ডোঙ্গায় উঠিব না!" প্রথমা যখন ডোঙ্গায় উঠিয়া দড়িটা টানাটানির একটু বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল, তখন দ্বিতীয়া কহিল, "চপলা আয় না, ঢের হয়েছে।" চপলা শুনিল না, সে হাসিতে লাগিল, এবং ডোঙ্গায় বসিয়া মজার খেলা খেলিতে লাগিল।

দৈবাৎ দাঁড়গাছি খুলিয়া গেল, এবং প্রবল স্রোতে ডোঙ্গাখানি ছুটিয়া চলিল। যে মেয়েটি কূলে ছিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "চপলা ভেসে গেল গো।" চপলার বয়স চতুর্দ্দশের অধিক নহে; সে কিন্তু চীৎকার করিল না। সাবধানে ডোঙ্গাখানি ধরিয়া বসিয়া রহিল। চীৎকার শুনিয়া অনেক লোক ছুটিয়া আসিল, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া জলে নাবিল না; অনেকেই কেবল মেয়েটির দুর্ব্বাবহারের সমালোচনা করিতে লাগিল। এক জন অপরিচিত ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া জলে ঝাপ দিয়া ডোঙ্গা লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে ডোঙ্গা ও সন্তরণকারী, দর্শকগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেল।

কে সাতরাইয়া গেল, কেহই তাহা বলিতে পারিল না। তখন নানা প্রকার সমালোচনা ও দৈব দুর্ঘটনার প্রাচীন গল্পের পর, দর্শকেরা ছেলেদিগকে শাসন করিয়া ঘরে ফিরিলেন। এই থানেশ্বরে চপলার জন্য কাঁদিবার কেহ ছিল না। চপলা শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা। এক জন অতি-দূর-সম্পর্কীয় ব্যক্তি দয়া করিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন, এইমাত্র। চপলার

প্রতিপালকের কন্যাটিকে বিধাতা সৌন্দর্য্য দান করেন নাই, কিন্তু সেই অপরাধে সুন্দরী চপলা তাঁহার বয়স্যার জননীর প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন নাই। নানা কারণে চপলার দুঃখে কাহারও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আশ্রিতা।

প্রায় এক ক্রোশ পথ ভাসিয়া যাইবার পর ডোঙ্গাখানি একটা বাঁকে ঘুরিয়া প্রায় কূলের নিকটবর্ত্তী হইল। সন্তরণকারীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সেই স্থানে ডোঙ্গা ধরিয়া ফেলিলেন। চপলা তখনও স্থির হইয়া ডোঙ্গা ধরিয়া বসিয়া ছিল; কোন দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই।

বলিষ্ঠ সন্তরণকারী যখন ডোঙ্গাখানি কূলে টানিয়া লইয়া চপলাকে নাবিতে বলিলেন, তখন তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, সে নাবিতে পারিল না। যুবক ধীরে ধীরে এক হাতে নৌকার ছেঁড়া দড়িটুকু ধরিয়া, অন্য হাতে বালিকাকে তুলিয়া কূলে নাবাইয়া দিলেন। উভয়েই আর্দ্রবস্ত্র। চপলা চলিতে পারে না। যুবক তাহাকে বহন করিয়া নিকটস্থ পল্লীতে গেলেন।

গ্রামের লোকেরা তাঁহাদিগকে কাপড় দিল, আহার দিল, তাঁহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। যুবক চপলাকে বলিলেন, "চল, তোমাকে গ্রামে রাখিয়া আসি।" চপলা কাঁদিয়া কহিল, তাহার কেহ নাই; যাঁহার গৃহে সে আশ্রিতা, সে তাহাকে মারিবে, এবং তিরস্কার করিবে। যুবক তখন বালিকাকে লইয়া একটি প্রান্তর পার হইয়া রাত্রিকালে একটি

সৈন্য-নিবেশের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। যুবককে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল; এবং জানাইল যে, তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য থানেশ্বরে যে সকল লোক গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে; এবং চারি দিকে তাঁহার সন্ধানে লোক গিয়াছে।

অবিলম্বে দশ জন দাসী নিযুক্ত করিবার জন্য যুবক আদেশ করিবামাত্র, "যে আজ্ঞা যুবরাজ!" বলিয়া লোক ছুটিল। এক প্রহর রাত্রির মধ্যেই দাসী নিযুক্ত হইল, স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং চপলা রাজকুমারীর মত সেবাশুশ্রূষা পাইতে লাগিল।

যুবক সৈন্যেরা যুবরাজ চন্দ্র গুপ্তের এই অভিনব অনুষ্ঠান দেখিয়া গা টেপাটিপি করিতে লাগিল; বয়স্কেরা বিরক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে, কাজটা ভাল হইল না। সকলেরই সন্দেহ হইল যে, এই কুড়ানী মেয়েটা বুঝি রাজরাণী হইয়া উঠিবে। রাজকুমারের এক জন ভৃত্য দর্প করিয়া বলিল যে, শ্রীমতী ধ্রুবদেবীর কাছে সংবাদ গেলেই রাজরাণীগিরি ঘুচিয়া যাইবে। যুবকটি মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; ধ্রুবদেবী যুবরাজের পত্নীর নাম। যুবরাজ পশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধযাত্রার জন্য বাহির হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইতিহাস।

যে চতুর্থ শতাব্দীর ঘটনা লইয়া এই আখ্যায়িকা, সে সময়ের রাষ্ট্রো-ন্নয়নের দু চারিটি কথা বলিতেছি। প্রাচীন ইতিহাসের সহিত অধিকাংশ

পাঠকের পরিচয় নাই বলিয়া, একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা লিখিতে গেলেও, ইতিহাসের কথা বলিতে হয়।

মৌর্য্যকুলতিলক দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়ে গান্ধার হইতে পূর্ব্ব উপকূল পর্যান্ত, নেপাল হইতে মহীশূর পর্য্যন্ত, সমগ্র দেশ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর কথা। তাহার পর যখন খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশের অধোগতি হইল, তখন সুঙ্গবংশীয় রাজারা ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে লিখিত আছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ক্ষুদ্র প্রদেশবিশেষের রাজা ছিলেন। এই দেশে তখন যবন, শক, তুরুষ্ক, চীনজাতীয়েরা আসিয়া রাজত্বস্থাপন করিতেছিলেন, এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত বৈদেশিক আক্রমণে প্রপীড়িত হইয়াছিল। অনার্যাজাতীয় অন্ধ্র রাজারা কেবল দক্ষিণ প্রদেশেই প্রবল হইয়াছিলেন; আর্য্যাবর্ত্তে বিদেশীয়দিগেরই প্রভাব বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে কালরাত্রির আরম্ভ, খৃষ্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দীতে তাহার শেষ।

এই দীর্ঘব্যাপী অন্ধকারের অবসানে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের সূচনা। সম্ভবতঃ শ্রীগুপ্ত এই গুপ্ত-বংশের প্রথম রাজা। শ্রীগুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচের রাজত্বের পর ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নেপাল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত জয় করিয়া, কানোজ-সন্নিহিত নূতন পুষ্পপুর বা কুসুমপুরে রাজধানী স্থাপিত করেন; এবং ঐ বৎসর হইতে নূতন গুপ্তাব্দের প্রথম বৎসর গণিত হয়।

প্রাচীন পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রের অদূরে লিচ্ছবি-বংশীয় রাজারা হীনবল হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন; এবং প্রধানতঃ নৈপালেই লিচ্ছবিদিগের

রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই লিচ্ছবি রাজারা গুপ্তদিগের অধীশ্বরত্ব স্বীকার করিতেন, এবং উঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন।

৩৫০ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বের আরম্ভ। সমদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য যখন যুবরাজ, এই আখ্যায়িকা সেই সময়ের কথা লইয়া। আলাহাবাদের স্তম্ভলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, বঙ্গ, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কোশল, সমুদ্র গুপ্ত কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল; এবং কেরল পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভূভাগেও তিনি রাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন।' মহারাজ অশোকের পর ভারতবর্ষে এমন গৌরবের দিনের ইতিহাস আর নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজমন্ত্রী।

মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের প্রিয় সচিব প্রিয়বর্ম্মা, কুসুমপুরের রাজপ্রাসাদে বসিয়া কতকগুলি লিপি পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বয়ং মহারাজ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্যের কুশল ত?" প্রিয়বর্ম্মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং রাজা তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। উভয়ে আসন গ্রহণ করিবার পর প্রিয়বর্ম্মা বলিলেন, "মহারাজ, এখন শক, যবন প্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া আদৃত হইয়াছেন; আপনাদের প্রতিও ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষ তিরোহিত হইয়াছে; এখন বিজিত রাজ্য সুরক্ষিত করিবার দিকে বিশেষ মনোযোগী হইবার প্রয়োজন।" মহারাজ কহিলেন, "পঞ্জাব ও

গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে ক্ষত্রপ রাজগণ বিজিত হইবার পূর্ব্বে, রাজ্যটিকে অখণ্ড মনে করিতে পারিতেছি না।" প্রিয়বর্ম্মা হাসিয়া বলিলেন যে, স্বয়ং যুবরাজ চন্দ্র গুপ্ত যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। মহারাজা কহিলেন, "তোমার পুত্র বিশ্ববর্ম্মা যখন তাঁহার সহচর ও সহকারী, তখন জয়ের আশা করিতে পারি বটে।" প্রিয়বর্ম্মা কহিলেন, "মহারাজ, আপনার অনুগ্রহের পরিসীমা নাই; আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নরবর্ম্মাকে আপনি মালবের শাসনকর্ত্তা করিয়া দিয়া আমার বংশ-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশ্ববর্ম্মা যদি যুবরাজের সহচর হইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে বটে, কিন্তু রাজ্যের কল্যাণের জন্য একটা প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা মনোযোগী হইলেন, এবং প্রিয়বর্ম্মা কহিতে লাগিলেন ;—"সংবাদ পাইলাম যে, হুন নামে একটা জাতি বড় বলশালী হইয়া উঠিয়াছে; এবং অচিরাৎ তাহাদের গান্ধার প্রদেশ অধিকার করিবার সম্ভাবনা। ভারতের পশ্চিম প্রদেশ সুরক্ষিত না হইলে কদাচ ভারতবর্ষের কল্যাণ হইবে না। হুনদিগের সন্ধান লইবার জন্য উপযুক্ত লোক প্রেরণ না করিলে নয়। বিশ্ব বর্ম্মা রোমকাদি পশ্চিমদেশীয় অনেক ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা জানেন। আমার ইচ্ছা যে, তাহাকে ঐ প্রদেশে প্রেরণ করি।" মহারাজ সচিবের স্বার্থশূন্যতা ও হিতৈষণায় চিরদিনই মুগ্ধ ছিলেন; তবুও এই প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন, "প্রিয়বর্ম্মা, আমি একটু ভাবিয়া দেখি, তাহার পর তোমার কথার উত্তর দিব।"

এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, পঞ্জাব হইতে যুবরাজের দূত আসিয়াছে। দূত যে সকল পত্র আনিয়াছিল, রাজা ও প্রিয়বর্ম্মা তাহা পাঠ

করিয়া অবগত হইলেন যে, যুবরাজের জৈত্রসেনা নির্ব্বিঘ্নে পশ্চিমপথবাহিনী হইয়াছে। ঐ পত্রগুলির সঙ্গে আর দুখানি পত্র ছিল; রাজা তাহা অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। যুবরাজপ্রেরিত পত্র দুইখানির একখানি মাতা দত্তদেবীর নামে, এবং অন্যখানি পত্নী ধ্রুবদেবীর নামে। ধ্রুবদেবীর পত্রে অন্য কথার মধ্যে এই কথাটি ছিল;—"তুমি হয় ত ভাব, তুমি ভারি রূপসী। থানেশ্বরে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ক্ষত্রিয়া কুমারী কুড়াইয়া পাইয়াছি: তাহাকে দেখিলে তোমার আত্মশ্লাঘা একটু কমিতে পারে।"

পঞ্চম অধ্যায়।

চপলার কথা।

ক্ষত্রপ রাজা স্বামী রুদ্রসেন, যুদ্ধ না করিয়াই সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন; কাজেই মহারাজের অনুমতির অপেক্ষায় যুবরাজের সৈন্যেরা ভরুকচ্ছে অবস্থান করিতেছিলেন। যে সময়ে যুবরাজ চপলার উদ্ধার করেন, তাহার পর হইতে তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই তিন মাসে চপলার সঙ্গে যুবরাজের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

চপলা একটি যবনীর শিক্ষাধীনে থাকিয়া চিত্র আঁকিতে শিখিতেছিল। পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে চপলার একটু শিক্ষা ছিল, এবং সে যাহা কিছু দেখিত, তাহারই ছবি আঁকিত। সেই জন্য যুবরাজ তাহার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চপলা ছবি আঁকিতেছে, এমন সময়ে চন্দ্রগুপ্ত গিয়া বলিলেন, "কি আঁকিতেছ চপলা?" চপলা তাড়াতাড়ি

আঁচল দিয়া ছবি ঢাকিয়া বলিল, "তা বলিব কেন?" যবনী হাসিয়া বলিল, "আজ একটা নাক আঁকিতেছে; বলিতেছিল যে, একটা ভাল নাক মক্‌স করিয়া লইয়া তার পর আপনার একটা ছবি আঁকিবে।" চপলা হাসিতে লাগিল। যুবরাজ স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নাকের উপর তোমার এত দৌরাত্ম্য কেন?" চপলা যবনীর গা টিপিয়া বলিল, "সে কথা বোলো না কিন্তু।" যুবরাজ বলিলেন, "কি কথা?" চপলার গোটা দশেক 'না না'র মধ্যে যবনী কহিল, "চপলা বলিতেছিল যে, আপনার নাকটা খারাপ হ'লে দেবী রাগ করিবেন।" চপলার লজ্জা হইল। যুবরাজ চলিয়া গেলে, চপলা যবনীকে বলিল, "মেলিনা, তুমি বড় দুষ্ট।"

আর একদিন বিশ্বকর্ম্মা, নন্দীভদ্র প্রভৃতি যুবরাজের প্রিয়পাত্রদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ লইয়া মেলিনা ও চপলার তর্ক চলিতেছে, এমন সময়ে যুবরাজ কুশলপ্রশ্ন করিতে আসিলেন। চপলা প্রথমেই বলিল, "আচ্ছা বলুন দেখি, নন্দীভদ্র খুব ভালমানুষ নয়?" যুবরাজ বলিলেন, "ভালমানুষ বই কি; নইলে তোমাকে রোজ রোজ বাদাম এনে দেয়?" চপলা বলিল, "আচ্ছা, বাদাম যদি নাই দিতেন; তবুও ত ভালমানুষ?" মেলিনা বলিল, "তিনি ভাল নয়, তা ত আর আমি বলিনি। আমি বলিতেছিলাম যে, বিশ্বকর্ম্মার মত লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।" চপলা যুবরাজকে বলিল, "দেখুন, বিশ্বকর্ম্মা ওঁদের গ্রীক্ কথা জানেন কি না, তাই এই পক্ষপাত।

আর এক দিনের কথা বলিতেছি। রাজধানীতে সন্ধির প্রস্তাব যাইবার পূর্ব্বে মহারাজের এক আদেশলিপি আসিয়াছিল যে, বিশ্বকর্ম্মাকে গান্ধার অভিমুখে চর-স্বরূপ যাইতে হইবে। সেই আদেশ পাইবার পর

যুবরাজ বড়ই চিন্তিত থাকিতেন। একদিন যুবরাজ নানা কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে চপলা আসিয়া বলিল যে, তাহার একটা সোনার পদক চাই। সরলা বালিকার আবেদনে তৃপ্তিলাভ করিয়া যুবরাজ কহিলেন, "কি রকম পদক, চপলা ?" চপলা চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দিল। "আচ্ছা, শীঘ্রই পাইবে" বলিয়া যুবরাজ পুনরপি চিন্তামগ্ন হইলেন। চপলার তাহা সহ্য হইল না ; সে রাগ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। যুবরাজ হাসিয়া তাহার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নূতন চিন্তা।

স্বনামখ্যাত বুদ্ধঘোষ তখনও ত্রিপিটকের টীকা লিখিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারিব না। কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধ উপদেষ্টা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ঘোষ, যুবরাজ চন্দ্র গুপ্তকে সুগত-মাহাত্ম্যের অনুরাগী করিবার জন্য তাঁহার যুদ্ধশিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুবরাজ সমস্ত দিন তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপোকথনের পর অপরাহ্ণে চপলার সংবাদ লইতে গেলেন। "বুদ্ধঘোষ দেখবি আয় !" বলিয়া মেলিনা চপলাকে ডাকিয়াছিল, চপলাও তাড়াতাড়ি তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন, চপলার ক্ষুদ্র কক্ষটুকু শূন্য। সেখানে তাহার কয়েকখানি চিত্র পড়িয়াছিল ; সেগুলি দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া রাজা কক্ষমধ্যে গেলেন। একটা পাখীর ছবির তলায় তাহার নূতন পদকখানিও ছিল। পদকখানি একটু নূতন রকমের ; যদি খুব বড় না হইত, তাহা হইলে

সেখানিকে একালের লকেট্ বলা চলিত। যুবরাজ অন্যমনস্কে ছবি দেখিতে দেখিতে পদকের ডালাটি খুলিয়া ফেলিলেন, এবং দেখিলেন, উহার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র চিত্র! ক্ষুদ্র চিত্রখানি দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, এবং ধীরে ধীরে পদকখানি বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া, দ্রুতপদে সেই কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে, মেলিনা ও চপলা এক সঙ্গে আসিতেছে। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" চপলা বলিল,—"আমি ভাবিয়াছিলাম যে, না জানি কি একটা নূতন জন্তু কিছু হইবে। মানুষ! আমরা বুদ্ধঘোষ দেখিয়া আসিলাম।" চন্দ্র গুপ্ত হাসিয়া বলিলেন, "চপলা, বুদ্ধঘোষ ভারি পণ্ডিত, সাধু পুরুষ।" চপলা তখন গম্ভীর হইয়া তাঁহার উদ্দেশে একটা প্রণাম করিল!

চপলার চঞ্চলতার অভ্যন্তরে যে স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্য ছিল, চন্দ্র গুপ্ত আজি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। চন্দ্র গুপ্ত বালিকার দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "চপলা, তুমি আর কত দিন এখানে থাকিতে পারিবে?" চপলা এবারে গম্ভীর হইয়া বলিল যে, আর ভাল লাগে না, তাহার কুসুমপুর দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে, সে ধ্রুবদেবীকে দেখিতে চায়। যুবরাজ বলিলেন, "তুমি ত কখনো তাঁহাকে দেখ নাই; তিনি কি তোমাকে ভালবাসিবেন?" চপলা মুখ উঁচু করিয়া বড় বড় চোখ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়! তিনি আমাকে খুব ভালবাস্‌বেন্।" যুবরাজ তাহা জানিতেন বটে; কিন্তু বালিকার এই প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন।

এই আনন্দের মধ্যে একটুখানি চিন্তারও উদয় হইল। সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হইল কি না, এবং বিশ্বকর্ম্মাকে অবিলম্বে গান্ধারে না পাঠাইলে চলে কি না, এই কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হূন-সংবাদ।

"আমি মহারাজের আদেশ উপেক্ষা করিয়া এখানে বসিয়া থাকিতে পারিব না। যখন সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে, তখন আপনি সন্ধি-স্থাপন করিয়া রাজধানীতে চলিয়া যান। আমি এক জন ভৃত্য লইয়াই ছদ্মবেশে গান্ধার যাত্রা করিব।" বিশ্ববর্ম্মার কথার প্রতিবাদ করা অসম্ভব। কিন্তু যুবরাজ বলিলেন,—"এ বিষয়ে আমি একটি দ্বিতীয় প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার জন্য আর একটু প্রতীক্ষা করিলে ক্ষতি কি?" বিশ্ববর্ম্মা কহিলেন, "যুবরাজ, মহারাজা বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা পালন না করিয়া অন্যবিধ প্রস্তাব করিলে কর্ম্মভীরুতা প্রকাশ পাইবে। বিশেষতঃ, যে জন্য এই আদেশ, তাহার গুরুত্ব আমরা অনুভব করিতেছি। সে দিন শ্রমণ কুমারজীব যাহা বলিতেছিলেন, তাহা-তেও হূনদিগের প্রভাববৃদ্ধির কথায় বিশ্বাস হইতেছে। এ সময়ে কালহরণ করা রাজদ্রোহিতা।" যাহা হউক, যুবরাজ বিষণ্ণচিত্তে অনুমতি দিলেন; তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল।

বিশ্ববর্ম্মা যুবরাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া একটি বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন, এবং আকাশের তারাগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিশ্ববর্ম্মা টলেমির গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, অনেক নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। এই জন্য তিনি যখন আকাশের দিকে চাহিয়া বসিতেন, কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিত না। অনেকক্ষণ পরে, যিনি নক্ষত্রগণের পতি, যিনি নরভাগ্যের নেতা, সজলনয়নে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। যদিও

মৌলনা ভিন্ন অন্য কেহ এ কথা জানিত না, তবুও কথাটা খুলিয়া বলাই ভাল, যে বিশ্ববর্ম্মা চপলার আনন্দময়ী প্রতিমার অনুরাগী হইয়া ছিলেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে গান্ধারে যাইতেছেন, কিন্তু চপলার জন্য মন উদ্বিগ্ন হইতেছে। চপলা তাহার আয়ত্তের অতীতে, বহু উর্দ্ধে, তাহাই মনে করিয়া পীড়িত হইতেছিলেন। চপলার প্রণয়প্রার্থী হইলে যুবরাজের সহিত এ বন্ধুত্ব আর থাকিবে না। সেই জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন যে, রাজ্যের সেবার জন্য, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য, তিনি আপনার মনের ব্যথা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

দু' চারিটি সাংসারিক কথা।

যুবরাজ যখন রাজধানীতে ফিরিলেন, তখন দক্ষিণ প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল যে মালবের উপকূলে চের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এই বিদ্রোহ নর্ম্মদা ও নাবারেবা উপস্থিত করিয়াছিল। ইতি হাসে ইহার তারিখ ৩৮০ খৃষ্টাব্দ। যুবরাজ অনেক দিন পরে রাজ্যে ফিরিয়াছেন বলিয়া, এবারে মহারাজা সমুদ্র গুপ্ত স্বয় দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। এই বিদ্রোহের সুবিধায় চের-রাজ্য জয় করিয়া, সিংহল পর্য্যন্ত যাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজা বহু সৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে চলিয়া গেলেন। দুটি বৎসর রাজ্যভার সম্পূর্ণভাবে যুবরাজের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। যুবরাজ দেখিলেন যে, প্রিয়বর্ম্মা যেখানে মন্ত্রী, সেখানে রাজ্যশাসন অতি সহজ।

বিশ্ববর্ম্মা যখন হূনদিগের সংবাদ সবিশেষ ভাবে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন, মহারাজ তখন সিংহল জয় করিয়া ফিরিয়াছেন, এবং তখন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। যুবরাজই সমগ্র রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

মহারাজের সিংহল-জয়ের প্রায় তিন বৎসর পরে মালবের শাসনকর্ত্তা নরবর্ম্মা পরলোকগমন করিলেন। প্রিয়বর্ম্মা একে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর এই শোকের আঘাত! তিনি এখন কদাচিৎ প্রয়োজন উপলক্ষ্যে রাজগৃহে আসিতেন; নচেৎ গৃহেই থাকিতেন। মালবের শাসনকর্ত্তার নিয়োগ বিষয়ে যুবরাজ চন্দ্র গুপ্ত যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সানন্দে তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। সে কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিতেছি।

নবম অধ্যায়।

নূতন-পুরাতন।

এক দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর প্রিয়বর্ম্মা গৃহের বারান্দায় শয়ন করিয়া আছেন, এবং একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার নিদ্রার বিঘ্ন জন্মাইয়া আনন্দদান করিতেছে। শিশুটি বৃদ্ধের নাতি। তিন বৎসর বয়সের ছেলেটি বৃদ্ধের পৈতাগাছটি লইয়া এক, পাঁচ, তিন করিয়া তার গুণিতেছে; মুখে হাত দিয়া, দাঁত নাই কেন, তাহার অনুসন্ধান করিতেছে, এবং সর্ব্বাঙ্গে নূপুর-পরা ছোট পায়ের ধূলা মাখাইয়া দিতেছে। তিনি শিশুর করস্পর্শে আনন্দে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। বালক "দাদা দাদা"

বলিতেছিল, এবং তিনি মুহূর্তের জন্য বৃদ্ধত্ব ভুলিয়া, অতীত যৌবনের অতীত তাঁহার শৈশবস্মৃতি স্মরণ করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, যেন তিনি আবার শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া শিশুদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন। দীর্ঘ দিবা নিদ্রার পর যেমন কখনও কখনও অপরাহ্নে প্রভাতের ভ্রান্তি হয়, বৃদ্ধের যেন তেমনই শৈশব ভ্রান্তি হইয়াছিল।

বৃদ্ধ যখন পুনর্জন্ম লাভ করিয়া স্বপ্নে মগ্ন, তখন শিশুর মাতা দেখিলেন যে, দুষ্ট ছেলেটা বড় উৎপাত করিতেছে। তিনি তাহাকে টানিয়া আনিতে গেলেন, সে আসিল না। অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন শিশু তাহা গ্রাহ্য করিল না। যুবতী ত জানিতেন না যে, এ সংসারে ঠাকুরদাদার মত মিষ্ট পদার্থ আর নাই। যুবতী শিশুকে একটু জোর করিয়া কোলে তুলিতে গেলেন, শিশু একটি টানে তাঁহার গলার হারগাছি ছিঁড়িয়া ফেলিল। বলজয়ী শিশু হারগাছি ফেলিয়া দিয়া যখন চুল ধরিল, তখন বৃদ্ধের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "থাক না মা লক্ষ্মী, টানাটানি ক'রে কি হবে? আমাকে কিছু বিরক্ত কচ্চে না।"

বৃদ্ধের মুখের কথা মুখে আছে এমন সময় যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিলেন, এবং যুবতী কোনও প্রকারে চুল ছাড়াইয়া গৃহের মধ্যে চলিয়া গেলেন। যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চপলা, তোমার ছেলে খুব দুষ্ট হয়েছে তা হোক, এস বন্ধু, আমার কোলে এস।" যুবরাজ ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন বন্ধু। পরেও ইনি বন্ধুবর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, সে কথা ইতিহাসজ্ঞেরা জানেন।

বন্ধু কিন্তু ছেঁড়া হারগাছির সঙ্গে একটা পদক পাইয়াছিল, সেইটাতে সে মনোযোগ দিয়াছে। পদকটি দৈবাৎ খুলিয়া গেল, এবং একখানি

কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। যুবরাজ তাড়াতাড়ি হাতে লইয়া তাহা রক্ষা করিলেন। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে যুবরাজের জানা ছিল যে, চপলা বিশ্ব বর্ম্মার ক্ষুদ্র ছবি আঁকিয়া পদকে পূরিয়া রাখিয়াছিল। যুবরাজ হাসিয়া হাসিয়া সে প্রতিকৃতিটি পদকে পূরিয়া পদক বন্ধ করিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইলেন; চপলার ভারি লজ্জা হইল। সে জানিত না যে, যুবরাজ তাহার পদকের কথা সব জানেন।

চপলা ভাল করিয়া কাপড় গুছাইয়া পরিয়া বাহিরে আসিয়া ছেলে কোলে নিল; এবং প্রিয়বর্ম্মা যুবরাজকে বসিতে বলিলেন। যুবরাজ তখন বিশ্ববর্ম্মার মালব-শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইবার সংবাদ দান করিলেন। চপলা বলিল, "না: বাবা এ বয়সে অত দূর কি ক'রে যাবেন?" যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "আমরা তাহার সুব্যবস্থা করিব।" চপলা তখন আবার বলিল, "তা হ'লে আপনি দেবীকে নিয়ে মালবে মাঝে মাঝে যাইবেন বলুন।" যুবরাজ স্বীকৃত হইলেন। চপলা এখনও তাঁহার আদরের আদরিণী ছোট বোনটি।

মণিমালা।

পূর্ব্বাভাষ।

[খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একটি ঘটনা লইয়া এই আখ্যায়িকা রচিত। বঙ্গের পশ্চিম বিভাগ তখন কর্ণ-সুবর্ণ নামে খ্যাত ছিল, এবং শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত কর্ণ-সুবর্ণের রাজা ছিলেন। কনোজে রাজ্যবর্দ্ধন রাজা এবং মগধে গুপ্তবংশীয় মাধব গুপ্ত রাজা। ইঁহাদের সকলের সঙ্গেই বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। রাজ্যবর্দ্ধনের পিতামহী গুপ্তবংশীয় মহাসেন গুপ্তের ভগিনী ছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধন কনোজের রাজা হয়েন; ইঁহারই সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক নগানন্দ, রত্নাবলী প্রভৃতি রচিত। খ্রীষ্টীয় ৬০৫ অব্দে সুগতভক্ত রাজ্যবর্দ্ধন, শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। একালে হর্ষবর্দ্ধনের যে দানলিপি পাওয়া যায়, তাহাতে রাজ্যবর্দ্ধনকে পরম ভট্টারক পরম সৌগত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।]

প্রথম অধ্যায়।

সঙ্কল্প।

মহারাজা রাজ্যবর্দ্ধনের রাজপ্রাসাদের মুক্তবাতায়ন পার্শ্বে দেবী মণিমালা উপবিষ্টা। মণিমালা গ্রন্থপাঠ করিতেছেন, এবং অদূরে দেবালয়ের

উচ্চ মঞ্চে বসিয়া সোমদত্ত তাঁহার অপরাহ্ণ-সূর্য্যকিরণ-প্রভাসিত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া আছেন। সোমদত্তের অপরাধ কি? বিধাতা যে উপাদানে চক্ষু গড়িয়াছেন, তাহার চরম সার্থকতা সৌন্দর্য্য-দর্শনে। মণিমালা মহারাজার একমাত্র দুহিতা—স্নেহের পুত্তলি। মালবের এক রাজপুত্রের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কনোজ হইতে মালব যাইবার পথে গঙ্গাতীরে রাজকুমারের আকস্মিক মৃত্যু হয়। কাজেই এই বাল-বিধবা, চিরদিন পিতৃগৃহেই রহিয়াছেন। সন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু রাজ-কুমারটির নাম অবগত হইতে পারি নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, কন্যার বালবৈধব্যই মহারাজার বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগের হেতু। যাহা হউক, মহারাজা দুহিতাকে নানা গ্রন্থপাঠে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই মনস্বিনীও অল্প বয়সেই অনেক পড়িয়াছিলেন, এবং নিরন্তর পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন। মণিমালা এখন ঊনবিংশ বর্ষ বর্ষীয়া। তাঁহার গৈরিকাচ্ছাদিত পৃষ্ঠতলে, বেণীনির্ম্মুক্ত কুন্তলরাশি, পশ্চিম গগনের অন্তর্বিচ্ছিন্ন তাম্ররাগরক্ত মেঘপৃষ্ঠে নীলাম্বরের মত শোভা পাইতেছিল। রূপসাগরে যৌবন-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছিল। গৈরিক বসনের ক্ষীণাবরণ কি সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া রাখিতে পারে? বরং সেই আচ্ছাদন যেন তাঁহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। বোধ হয়, সোমদত্ত ভাবিতেছিলেন, যে "মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।"

মণিমালা নির্ব্বাণ-মাহাত্ম্য পড়িতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে একবার সোমদত্তের দিকে দৃষ্টি পড়িল; এবং সোমদত্তকে দেখিয়াই ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন, বোধ হয় এই ভ্রূ-কুঞ্চনে তিরস্কার ছিল; কেন না সোমদত্ত কাতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সোমদত্ত চলিয়া গেলেন, মণিমালাও গ্রন্থ রাখিয়া দিয়া নির্ব্বাণ-ধ্যান করিতে বসিলেন। অনেকক্ষণ ধ্যান করিলেন; অবশেষে যখন পরিচারিকাগণ আসিয়া গৃহে প্রদীপ জ্বালিল, তখন গৃহমধ্যে একাকিনী পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে, মহারাজা তাঁহার তত্ত্ব লইবার জন্য আসিতেছেন। মণিমালা স্বহস্তে পিতার জন্য আসন স্থাপন করিলেন। মহারাজা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সোমদত্ত তোমাকে কয়েকখানি কাব্য পড়িতে দিয়াছিলেন, সেগুলি ভাল লাগিল?" মণিমালা বলিলেন "হাঁ, কাব্যগুলি ভাল।" কিন্তু কাব্যপাঠে এখন আর তাঁহার তত অনুরাগ নাই। এখানে বলিয়া রাখি যে, সোমদত্ত মহারাজার আত্মীয়, প্রিয়পাত্র এবং সৈন্যাধ্যক্ষ। রাজা হাসিয়া বলিলেন যে, সোমদত্ত তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তোমার কাব্যানুভূতি ভাল; ঐ বিষয়ের আলোচনায় মানসিক প্রফুল্লতা থাকে। মণিমালা কহিলেন যে, তিনি এখন বুদ্ধঘোষের টীকা সম্বলিত ধর্ম্ম গ্রন্থপাঠে বড় তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। ঐ বিষয়ে নানা কথার প্রসঙ্গের পর, মণিমালা পিতার সম্মুখে যুক্ত করে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আজ আমি একটি ভিক্ষা চাহিতেছি।" রাজ্যবর্দ্ধনের বিস্তৃত রাজ্যে এমন কি আছে, যাহা মণি-মালাকে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে? রাজ্যবর্দ্ধন দুহিতার শিরোদেশ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব; যাচ্ঞার অপেক্ষা কি?" মণিমালা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ করিব; রাজপ্রাসাদে আর থাকিব না; আমাকে প্রসন্নমনে বিদায় দিতে হইবে।"

যাহার অজেয় শস্ত্রভয়ে পৃথিবী কাঁপিত, তাঁহার হৃৎকম্প হইল। রাজা উদ্দেশে সুগতকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মা, সংসারে থাকিয়া কি ত্যাগিনী হওয়া যায় না? তোমার সংকল্পে বাধা দিলে মহা পাপ হইবে; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, এই দুরূহ কার্য্য তুমি করিতে পারিবে কি না?" মণিমালা স্থিরস্বরে কহিলেন, "এ সংসারে থাকিলে বাসনার নির্ব্বাণ হয় না; সুগত আমাকে কৃপা করিবেন, আমি ভিক্ষুণী হইব। আপনি অনুমতি করিলে আর তিন দিন পরেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিব।"

একদিকে ধর্ম্মানুরাগ, অন্যদিকে স্নেহ-বন্ধন। একদিকে সমগ্র রাজ্য, অন্যদিকে মণিমালা। রাজা মনে মনে বলিতেছিলেন, "তোমাকে না দেখিলে বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না," কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তিও হইল না। অনেকক্ষণ পরে ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি;" অমনি মণিমালা বলিয়া উঠিলেন "সংঘং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

রাজপ্রাসাদের সুখ ফুরাইল; রাজত্বের সুখ ফুরাইল। রাজ্যবর্দ্ধন কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন; এবং একটি বিজন কক্ষে বসিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজ সভা।

মণিমালা ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগিনী হইবার পর, মহারাজা, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ সোমদত্তকে সঙ্গে লইয়া

সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং অন্যান্য লোকদিগকে বিদায় দিয়া, বহুবিধ বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সোমদত্ত উন্মনা, কোন কথাই কহিতেছেন না; কেবল রাজার অনুরোধে বসিয়া আছেন এই পর্য্যন্ত। রাজা বলিলেন, "হর্ষবৰ্দ্ধন, যে ব্যক্তি রাজ-প্রাসাদে বসিয়া সুখভোগের লালসায় রাজত্ব করে, সে দস্যু এবং প্রজাঘাতক। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছে, যেন আমি চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া জীবনধারণ করিতেছি।" হর্ষবৰ্দ্ধন বলিলেন, "মহারাজ, আপনার মত প্রজাবৎসল কে আছে! আপনার মত অধীশ্বর লাভ কোন রাজ্যের অদৃষ্টে ঘটে?" রাজাবৰ্দ্ধন মাথা নাড়িলেন; এবং বলিলেন, "আত্মশ্লাঘায় সুখ আছে বটে, কিন্তু সে সুখ ক্ষণিক মাত্র। ভারতবর্ষের হিতকামনায় কিছু করিতে হইবে। আমি যাহাতে আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সুগতের কৃপায় ভারতবর্ষের সেবা করিতে পারি, তাহার উদ্যোগ করিব।" এই কথা শুনিয়া হর্ষবৰ্দ্ধন এবং সোমদত্ত উভয়েই রাজার মুখের দিকে চাহিলেন।

রাজা কহিতে লাগিলেন, "দেখ, এই ভারতবর্ষ দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইবে, তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। কাশ্মীর, পঞ্জাব, মালব, সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যে যাহার মত রাজা হইয়া, কর সংগ্রহ করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতেছি। ইহা অপেক্ষা অধিক স্বার্থপরতা আর কি আছে? এই প্রকার রাজত্বকেই আমি দস্যুবৃত্তি বলি। অশোক রাজার পর আর এদেশে একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল না। একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, যদি আমার রাজ্য ধ্বংস হয়, ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহা ভিন্ন ভারতের স্থায়ী উন্নতির আর অন্য পন্থা নাই।" সোমদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই রাজ্য মগধ কিম্বা উজ্জয়িনীপতিকে দিলে

কি ভারতে একছত্র রাজত্ব হইবে?" রাজা কহিলেন, "তাহা নহে; পূর্ব্বকালে দিগ্বিজয়ের প্রথা ছিল, এখন আবার তাহাই করিতে হইবে। ইহাতে রাজ্যের মধ্যে আশু অশান্তি উৎপন্ন হইবে বটে, কিন্তু দেশময় সামরিক ভাব জাগ্রত হইবে। রাজাগণ আলস্য পরিত্যাগ করিবেন এবং এই সময়ে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, তাঁহারই রাজত্ব স্থাপিত হইবে। আমি দিগ্বিজয় করিব।" সোমদত্ত হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, রাজত্ব হইল দস্যু-বৃত্তি, আর দিগ্বিজয়টা পুণ্য কর্ম্ম?" রাজা কহিলেন, "পুণ্য কর্ম্ম বৈ কি? যাহাতে সমগ্র ভারতবাসী এক সূত্রে গ্রথিত হয় এবং একই জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হয়, তাহা অপেক্ষা পুণ্য কর্ম্ম আর কি আছে? এই যুদ্ধে হয় ত কনোজের নাম চিরদিনের মত লুপ্ত হইবে; হউক ক্ষতি কি? দেশহিতযজ্ঞে আমরা সকলে ইন্ধন হইব; এবং যজ্ঞভস্ম হইতে ভারতমঙ্গল নবরাজ্যের অভ্যুদয় হইবে। সোমদত্ত, তুমি সৈন্যদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও; হর্ষবর্দ্ধন, তুমি রাজ্য-শাসন-ভার গ্রহণ কর।" হর্ষবর্দ্ধন কহিলেন, "মহারাজ, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হউক; আমি আপনার অনুপস্থিতিকালে ভৃত্য স্বরূপে রাজকার্য্য করিব। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আপনার জৈত্র-যাত্রা প্রথমে কোন্ দিকে হইবে?" রাজা বলিলেন, যে কর্ণ-সুবর্ণে এক নূতন রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র নামগ্রহণ করিয়া উৎকল, তাম্রলিপ্ত এবং বঙ্গদেশ শাসন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। প্রথমে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন; কারণ নূতন রাজার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলে অন্য কাহারও আপত্তি হইবে না। সোমদত্ত মনে মনে ভাবিলেন যে, মণিমালা-বিহীন সংসারে যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। যাহা হউক, স্থির হইল যে, শীঘ্রই মহারাজার দিগ্বিজয় আরম্ভ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

গঙ্গাতীরে।

সোমদত্তের নির্ভীকতা এবং বীর্য্যের সম্মুখীন হইতে পারে, এমন সেনা কর্ণ-সুবর্ণে ছিল না। শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিল; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শরবিদ্ধ হইয়া মহারাজা রাজ্যবর্দ্ধন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়াছিলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া মহারাজাকে গঙ্গাতীরস্থিত শিবিরে লইয়া গেল। শিবিরে গিয়া মহারাজা একজন চরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে যে কার্য্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার ফল কি হইল?" চর ইঙ্গিতে উত্তর দিয়া কহিল, "তিনি আসিয়াছেন।" রাজা তখন সকলকে শিবিরের বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। সকলে চলিয়া গেল; তখন একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুর সহিত মণিমালা রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিমালা ভাল আছ?" মণিমালা রাজার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সুগত কৃপায় আমার কুশল। কিন্তু আমি তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি!" রাজা বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকেও বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া মণিমালাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন, "তুমি যখন ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে, তখন বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি যে, আলস্যময় জীবন অপেক্ষা এই ব্রহ্মচর্য্যই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুগত তোমার মঙ্গল করিবেন; আমি তোমাকে সৎপথগামিনী দেখিয়া আনন্দে মরিব।" মণিমালা, মৃত্যুর কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; দেখিল, তাহার বসন রাজদেহ সংস্পর্শে রক্তাক্ত হইয়াছে। মণিমালা কাঁদিয়া উঠিল।

রাজা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু, সুখের মৃত্যু। মণিমালা তাহা বুঝিল না। চীৎকার করিয়া উঠিল; সকলে আসিল; মণিমালা তখন পিতার অবসন্ন মস্তক ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। কন্যার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া সুগত নাম স্মরণ করিতে করিতে মহারাজা রাজ্যবদ্ধন জীবন-নির্ব্বাণলাভ করিলেন।

মহারাজার সৎকারাদির পর, মণিমালা বৃদ্ধ ভিক্ষুর সহিত কোথায় যে নিরুদ্দিষ্টা হইলেন, সোমদত্ত তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়া হউক মণিমালাকে উদ্ধার করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সোমদত্ত সৈন্যদল পরিত্যাগ করিলেন, এবং নৈশ অন্ধকারে একাকী শিবির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজ-গৃহ।

মগধাধিপতি মাধব গুপ্ত শৈব ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের প্রতি সর্ব্বদাই সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সাহায্যে এবং অনুগ্রহে, রাজ-গৃহে বৌদ্ধদিগের প্রভাব পূর্ব্বকালের মত অক্ষুণ্ণ ছিল। পাঠকেরা জানেন যে, এখনও রাজ-গৃহে অনেক পুরাতন বৌদ্ধকীর্ত্তি আছে। আজ রাজ-গৃহে বৌদ্ধদিগের একটি সভা আহুত হইয়াছে; এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। ভিক্ষুবেশধারী ভিক্ষুব্রতাবলম্বী সোমদত্ত, রাজ-গৃহে বসিয়া ভাবিতেছেন, মণিমালা কি এখানে আসিবেন না? এমন সময়ে সদাভিক্ষু নামক একজন বৃদ্ধ ভিক্ষু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,

"মুমুক্ষু, উদয়গিরিবাসিনী সংঘদাসী ভিক্ষুণীর নাম শুনিয়াছ? তিনি আজ অশোকচরিত গান করিতেছেন, শুনিবে চল।" সোমদত্তের মনে একই ভিক্ষুণীর নাম জাগরিত, তবুও তিনি বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। দেখিলেন, ভিক্ষুণী গাহিতেছিলেন ঃ

অশোক কর সশোক হৃদি,
কর এ প্রাণ শান্তরে!
আমি চরণে দলি বাসনা গুলি,
নির্ব্বাণ লভি অন্তরে।

সোমদত্ত আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; অভিভূত চিত্তে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। ভিক্ষুগণ সোমদত্তের ভাবপ্রবণতা দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; সকলেরই দৃষ্টি সোমদত্তের দিকে পড়িল। ভিক্ষুণী দেখিলেন, ভিক্ষুবেশধারী ব্যক্তি সোমদত্ত। তিনি আর গান গাহিলেন না; সহসা মণ্ডলীর মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন। মণিমালা ভিক্ষুণী হইয়া সংঘদাসী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সংঘদাসী চলিয়া যাইবার পর, অন্য ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ গান গাহিলেন; সোমদত্ত জড়পুত্তলির মত কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া, পরে উঠিয়া গিয়া একাকী চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সংঘদাসী একাকিনী বৃক্ষতলে বসিয়া বসনাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। নির্জ্জনতার সুবিধা পাইয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া ডাকিলেন, "মণিমালা!" মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না; কম্পিত স্বরে, কাতর দৃষ্টিতে, সোমদত্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এই ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়াছ কেন?" সোমদত্ত বলিলেন, "মণিমালা, আমি তোমার জন্য বনচারী।"

মণিমালা কহিলেন, "আমি বিধবা ; আমার পক্ষে সুখ স্পৃহা লোকাচার বিরুদ্ধ এবং নিন্দনীয়। আমি আত্মসুখের জন্য নিন্দা কুড়াইব না বলিয়া, সংসার ত্যাগ করিলাম ; তুমি এখানে আসিয়া দেখা দিলে কেন ?" কতবার বলিয়াছি আমি তোমার দাসী, আমি তোমার প্রণয় প্রার্থিনী। তুমি জানিয়া শুনিয়াও নিরপরাধিনী রমণীর ব্রহ্মচর্য্যে বাধা দাও কেন ?" সোমদত্ত বলিলেন, "তুমি আমার মোক্ষ, তুমি আমার নির্ব্বাণ ; তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমার সদ্গতি কোথায় ?" ভিক্ষুণী তখন বৃক্ষের একটা লুণ্ঠিত শাখা দুই হস্তে জোর করিয়া ধরিলেন ; এবং সেই শাখায় মাথা রাখিয়া বলিলেন, "আমি বাসনা বিনাশ করিবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি ; তোমাকে ভুলিবার জন্য নির্ব্বাণ সাধনা করিতেছি।" সোমদত্ত একটু খানি অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি অবলা, আমি রমণী ; আমি আত্ম-সংবরণ করিতে পারিব না।" সোমদত্ত বলিলেন, তুমি যখন বৈদিক ধর্ম্ম মান না, তখন বিধবার বিবাহ হয় না, এই নূতন ব্যবস্থা স্বীকার করিবে কেন ?" মণিমালা বলিলেন, "আমি ভিক্ষুণী।" উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময় সদাভিক্ষু আসিয়া বলিলেন, "ভিক্ষু ভিক্ষুণী, নির্জ্জনে পুরুষ ও রমণীর একত্র অবস্থান নীতিবিরুদ্ধ। তোমরা যে যাহার আশ্রমে গমন কর।" উভয়েই কম্পিত দৃষ্টিতে সদাভিক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিহারে গমন করিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাজ-গৃহের বিহারপতি, সোমদত্তকে আসিয়া বলিলেন, "মুমুক্ষু, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যতদিন চিত্ত সংযম না হয়, আমার অনুমতি ভিন্ন এই গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোথাও যাইতে পারিবে না।" সোমদত্ত নীরবে আদেশ শ্রবণ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

নির্ব্বাণ-সাধনা।

বসন্তের নব পল্লব প্রভাত-সমীরণে কাঁপিতেছিল; কিন্তু কোথাও পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি নাই। পাখীরা বুঝি গান গাহিয়া উড়িয়া গিয়াছিল; ক্বচিৎ কপোতকূজন ভিন্ন অন্য কিছু শুনিতে পাওয়া যাইতে ছিল না। খণ্ড-গিরি এবং উদয় গিরির শৈলগুহা বৌদ্ধ পরিব্রাজক পূর্ণ; কিন্তু কোথাও মনুষ্যের কণ্ঠ বা পদ ধ্বনি নাই। ঊষার অস্ত হইল; অরুণোদয় হইল; প্রভাত সূর্য্য, তরল আলোকে বিশ্ব প্লাবিত করিল; তখনও ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ একাগ্রচিত্তে নির্ব্বাণ-ধ্যান করিতেছিলেন। সকলেই ধ্যান মগ্ন, কেবল শৈলপাদমূলে দেবী মণিমালা একজন পরিণত বয়স্কা ভিক্ষুণীর সহিত মৃদুকণ্ঠে কথোপকথন করিতেছিলেন। বৃদ্ধা ভিক্ষুণী বলিলেন, "তুমি সমস্ত রাত্রি একাকিনী এখানে বসিয়া ধ্যান করিয়াছ; এত কঠোর তপস্যা কেহ কখনও করে নাই। ভগবান সিদ্ধার্থ তোমাকে সিদ্ধিদান করুন।" মণিমালা কহিলেন, "মুক্ত-ভিক্ষুণী, আমার অন্তঃকরণ বাসনাময়; আমি নির্ব্বাণ-ধ্যান করিতে পারিতেছি না।" বিজনে বৃক্ষ-তলে সোমদত্তের সহিত মণিমালার কথোপকথনের কথা, সদা ভিক্ষুর মুখে সকলেই শুনিয়াছিল। সেই কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার জন্যই মুক্ত-ভিক্ষুণী কথা পাড়িয়াছিলেন। একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুণী, সোমদত্ত ছদ্মভিক্ষুবেশধারী। বিহারপতির সহিত তাঁহার যে তর্ক হইয়া-ছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সুগত মনুষ্য মাত্র, এবং উপনিষদের

ধর্ম্মই চরম ধর্ম্ম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সুগত ঋষি, কেন না তিনি মন্ত্র-দ্রষ্টা; তিনি ঈশ্বর নহেন, কিন্তু অনন্ত করুণাময়। সে কথা শুনিয়া বিহারপতি তাঁহাকে ভিক্ষুশ্রেণী হইতে অন্তর করিয়া দিয়াছেন; তিনি এখন সামান্য শিক্ষার্থী ধর্ম্ম-সেবক মাত্র।" মণিমালা একবার মুখ পুঁছিলেন; এবং তাহার পর বলিলেন, "সেশ্বর ধর্ম্ম কি সৌগতের অগ্রাহ্য?" বয়স্কা অনেক ভাবিয়া কহিলেন, "হয় ত সেশ্বর ধর্ম্মের সহিত আমাদের তত বিরোধ নাই; কিন্তু সোমদত্ত কামিনী কাঞ্চন প্রয়াসী।" মণিমালার অন্তঃ-করণে ক্ষোভের সঞ্চার হইল; তিনি কহিলেন, "যে একথা আপনাকে বলিয়াছে, সে কুদৃষ্টি। আপনাদিগের সমগ্র বৌদ্ধবিহারে যদি কাঞ্চন লোভশূন্য কেহ থাকে, সে সোমদত্ত; যদি কেহ পরম সৌগতের মত জিতেন্দ্রিয় থাকে, সে সোমদত্ত।" মুক্ত-ভিক্ষুণী বলিলেন "মা, তোমার অন্তঃকরণ সোমদত্তময়। সোমদত্ত তোমার নির্ব্বাণ-ধ্যানের বিঘ্ন; এই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছিলাম। তুমি সুগতের চরণ ধ্যান কর, সোমদত্তকে ভুলিয়া যাও। যাও, রাণী-গুহার সম্মুখে যে প্রস্তরময় সুগত-মূর্ত্তি আছে, সেখানে বসিয়া ধ্যান কর।" মণিমালা তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, যৌবন-প্রভাতে, যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে ভুলিতে পারিব না। আমি আজ পর্য্যন্ত কখন নির্ব্বাণ-ধ্যান করিতে পারি নাই। জাগরণে ও স্বপ্নে সেই পবিত্র-মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছি।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "তপস্যা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব আশা ছিল; কিন্তু দিন দিন চিত্তবেগ অসংবরণীয় হইয়া উঠিতেছে।" কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে মণিমালার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। মুক্ত-ভিক্ষুণী বোধ হয় সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত জীব ছিলেন না; নারী হৃদয়সুলভ

করুণায় তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। আদর করিয়া মণিমালাকে বক্ষ-সংলগ্ন করিয়া, তাঁহার পদ্মপর্ণোপম করতলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সকলের নগর-ভ্রমণের সময় উপস্থিত হইল; উদয় গিরির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, প্রণাম উচ্চারিত হইল। সর্ব্বত্র একই ধ্বনি উত্থিত হইল:—"প্রণমামি সুগত তব চরণে"। এই দুইটি ভিক্ষুণীও আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। একজন নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন, এবং অন্যজন প্রস্তরময় সুগত-মূর্ত্তির উপাসনায় শৈল আরোহণ করিলেন। মণিমালা প্রস্তর-মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া বসিলেন, অনেক ধ্যান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন চক্ষুর জল ফেলিয়া সেই বিজন-শৈলে একাকিনী গান গাহিতে লাগিলেন:-

তুমি থাক গো হৃদয় মাঝে হৃদয়-সখা প্রাণপতি।
মুদিয়া আঁখি নিরখি আমি প্রেমময় ও মূরতি।
(আমি) পাষাণে তোমারে নাথ, গড়িতে পারিব না ত;
কোমল অতি তোমার চিত, পাষাণে গড়া আমারি মতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চিল্কা-তটে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও খণ্ডগিরির অদূরবর্ত্তী মালভূমে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। চালুক্য-রাজ পুলকেশী সবে রাজমহেন্দ্রি নগরী আক্রমণ করিয়াছিলেন; নর্ম্মদা এবং কৃষ্ণার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র দেশ তখন করায়ত্ত হয় নাই। কলিঙ্গ রাজগণ বহু শত্রুর

আক্রমণে পূর্ব্ব হইতেই হীনপ্রভ হইলেও, গোদাবরী হইতে চিল্কা পর্য্যন্ত ভূ-ভাগ শাসন করিতেছিলেন। এমন কি, এই সময়ের ১৫০ বৎসর পরেও, কলিঙ্গ-রাজার সমুদ্রগামী পোত, চিল্কার বন্দরে থাকিত বলিয়া, চীন পরিব্রাজক উল্লেখ করিয়াছেন। তখন পর্য্যন্তও চিল্কা, হ্রদে পরিণত হয় নাই; দেশমধ্যবর্ত্তী উপসাগররূপেই ছিল। তখন চালুক্য বংশীয়েরা, নবোদ্যমে কলিঙ্গ-রাজকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; রাজাও এই সময়ে চিল্কা-তটে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

সোমদত্ত অধিক দিন রাজ-গৃহে বাস করিতে না পারিয়া, বৌদ্ধদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকল ক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের আরাধ্যা মণিমালার উদ্দেশে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়! কোথায় তাঁহার মণিমালা? বৌদ্ধ পরিব্রাজকদিগের অভেদ্য দুর্গে, তাঁহার আর প্রবেশাধিকার নাই। যেখানে পোতমালা-শোভিতা চিল্কা, তরঙ্গভঙ্গচঞ্চলা, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সোমদত্ত একবার ভাবিলেন, "মরিলে হয় না?" উপসাগরের অবর্ণনীয় শোভা দেখিতে দেখিতে উপনিষদের ঋষিবাক্য মনে পড়িল:

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ
তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ।

তিনি যখন চিন্তাপরায়ণ, তখন একজন সৌম্যমূর্ত্তি যুবক তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সোমদত্ত যখন দেখিলেন যে, এই যুবক কলিঙ্গাধিপতি, তখন আত্ম-পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অনেক কথোপকথনের পর জানা গেল যে, সোমদত্ত একজন বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশীয় যুবক। সোমদত্ত রাজার অতিথি হইলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই অকাট্য বন্ধুত্বে উভয়ে সম্বদ্ধ হইলেন। সোমদত্তের যুদ্ধ কুশলতা তৎকালে কোথাও

অবিদিত ছিল না; রাজা তাঁহাকে সেইজন্যও আদর করিয়া রাখিয়াছিলেন। সোমদত্তের প্রশান্ত মুখকান্তি ছায়াযুক্ত ছিল ; রাজা সর্ব্বদাই তাহা লক্ষ্য করিতেন ; কিন্তু গভীর বন্ধুত্ব সত্ত্বেও কারণ অবগত হইতে পারেন নাই।

একদিন সোমদত্ত রাজ-শিবির হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে লোকচারণ ভূমি হইতে বহু দূরে গিয়া চিল্কা-তটে বসিয়া, তরঙ্গ-বিক্ষোভ-শীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন। তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে একটি ক্ষুদ্র শিলার আবরণ ছিল ; কেহ সেখানে আসিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। এমন সময় একজন দীর্ঘপক্কশ্মশ্রুধারী ব্যক্তি, একখানি নৌকা বাহিয়া, সাগর-জল-মগ্ন একটি ক্ষুদ্র শিলার উপর গিয়া দাঁড়াইল, এবং ধীরে ধীরে নৌকাখানি সমুদ্রজলে ডুবাইয়া দিল। আপনার প্রত্যাগমনের পথ আপনি বন্ধ করিয়া এমন সময়ে কি অভিপ্রায়ে বৃদ্ধটি শিলার উপর দাঁড়াইল, বুঝিতে পারিলেন না। নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে ধীবরদিগের আর একখানি ক্ষুদ্র নৌকা সেখানে ছিল। নিঃশব্দে তাহাতে উঠিয়া শিলার পার্শ্বে চলিয়া গেলেন। দেখিলেন, লোকটি চিন্তামগ্ন ; তাঁহাকে লক্ষ্যই করিতেছে না। পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া বসিলেন। লোকটি ধ্যান করিতেছিল ; ধ্যান-শেষে সুগত এবং ব্রহ্মকে নমস্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিল। সোমদত্ত দৃঢ়মুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। সমুদ্র-তরঙ্গ উভয়ের পদতল ধৌত করিতেছিল। ধৃত ব্যক্তি কহিল, "আমি আশ্রমত্যাগ করিয়াছি, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, আমার জীবন-নির্ব্বাণে বাধা দিবার তুমি কে ?" সোমদত্ত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ; বলিলেন "মণিমালা, মণিমালা, মরিও না।" চন্দ্রোদয় হইয়াছিল ; চন্দ্রকিরণসমুজ্জ্বল সমুদ্রতরঙ্গ, আবার

আসিয়া তাঁহাদের চরণ ধৌত করিয়া দিল। কৃত্রিম পক্ককেশ জলে নিক্ষিপ্ত হইল; এবং সোমদত্তের বাহুবেষ্টনবদ্ধা মণিমালা, কূলে নীতা হইলেন।

প্রবাদ আছে যে কলিঙ্গপতি, সোমদত্ত এবং মণিমালাকে বিবাহ দিয়া কয়েক খানি গ্রামদান করিয়াছিলেন। যে গ্রামে প্রধানতঃ তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, রাজার অনুমতি লইয়া, তাঁহারা সেই গ্রামকে ব্রহ্মপুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই কি একালের ব্রহ্মপুরম্?

নব-দম্পতি, স্বীয় আবাস-গৃহের পুরোভাগে একখানি প্রস্তরে একটি শ্লোক খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই শ্লোকটি আর পাওয়া যায় না; কিন্তু শুনিয়াছি যে, তাহার ভাবার্থ এই যে, প্রেমই ধর্ম্ম—প্রেমই মুক্তি।

অনঙ্গপ্রভা

[অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাকাটকবংশীয় প্রথিতনামা প্রবরসেন, একালের মধ্য-প্রদেশের চাঁদা নগরীর অনতিদূরে, প্রবরপুর নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন রাজধানী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হইলেও রাজা প্রবরসেন এখানেই সপরিবারে বাস করিতেন। পূর্ব্বকালে বাকাটক রাজগণ দক্ষিণাঞ্চলের অনার্য্যরাজাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেন। এমন কি, প্রবরসেনের প্রপিতামহ রুদ্রসেন, অনার্য্য লিঙ্গ উপাসক রাজা ভবনাগের কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় বংশে অনার্য্যদের পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবরসেনের পিতা দ্বিতীয় রুদ্রসেন, মগধাধিপতি আদিত্যসেনের পৌত্রী প্রভাবতী গুপ্তাকে বিবাহ করিয়া অনার্য্যসংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, যে এই জন্যই স্বনামাঙ্কিত প্রবরপুরেই রাজা প্রবরসেন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। আখ্যানকের সমগ্রটি বুঝাইবার জন্য এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা সূচনা স্বরূপে লিখিলাম।]

প্রথম অধ্যায়।

শারিকা পিঞ্জরস্থা।

রাজপ্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে, রাজকুমারী অনঙ্গপ্রভা, প্রভাতে এবং সায়াহ্নে ক্রীড়া করিতেন। রাজসেনাপতি বাপ্পাদেবের পুত্র, সুব্রত, তাঁহার বাল্য-ক্রীড়ার প্রধান সহচর ছিলেন। তাঁহারা আশৈশব একত্রে খেলা করিয়া

আসিয়াছেন এখনও করিতেন। এখনও করিতেন; কেন না রাজকুমারীর বয়স দ্বাদশ বর্ষও উত্তীর্ণ হয় নাই, এবং সুব্রতও চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক মাত্র।

ইহাকে প্রেম বলিতে চাও, ভালবাসা বলিতে চাও, অনুরাগ বলিতে চাও, যাহা বলিতে চাও বল; অনঙ্গপ্রভাকে দুবেলা দেখিতে না পাইলে সুব্রতের ভাত হজম হইত না। অনঙ্গপ্রভা বালিকা; কিন্তু সে বুঝিতে পারিত যে সুব্রত তাহার দুটা কথা শুনিবার জন্য, তাহাকে একটুখানি খুসী করিবার জন্য, সর্ব্বদাই উৎসুক। বুঝিতে পারিয়া সে নানা রকম দুষ্টামি করিত। যখন দেখিত যে সুব্রত তাহার সঙ্গে কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন ছুটিয়া দূরে গিয়া অন্য কাহারও সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিত। তাহার পর আবার যখন দেখিত যে সুব্রত ম্লানমুখে একাকী কোথাও বসিয়া আছে, তখন চুপে চুপে পিছন হইতে গিয়া, হয় তাহার চোখ টিপিয়া ধরিত, না হয় একটা কিল মারিত। সুব্রতের আহ্লাদের সীমা পরিসীমা থাকিত না। এইরূপে সুব্রতের চিত্তগগন কখনো মেঘে ঢাকিয়া, কখনো রৌদ্রে প্রভাসিত করিয়া, অনঙ্গপ্রভা খেলা করিত।

একদিন প্রভাতকালে অনঙ্গপ্রভা একাকিনী উদ্যানের ছায়াতলে বসিয়া একটি শালিক পাখীকে একবার খাঁচায় পুরিতেছিল, একবার বাহির করিতেছিল, একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, একবার তাহাকে তিরস্কার করিতেছিল, এবং এই প্রকারে আরও নানা রকমে পোষা পাখীটি লইয়া খেলা করিতেছিল। খেলার সঙ্গী সঙ্গিনীরা আজ কেহই কাছে ছিল না; সহসা শালিকটি উড়িয়া গিয়া একটা গাছের শাখায় বসিল। বালিকা ব্যস্ত হইয়া আয় আয় বলিয়া ডাকিল; পাখীটি আরও একটু উঁচু ডালে বসিল। দুধমাখা ছাতুর বাটিটি হাতে উঁচু

করিয়া ধরিয়া ডাকিল; দুষ্টপাখী খুব বড় একটা গাছের উপরে গিয়া বসিল। রাজকুমারীর চোখে জল আসিল; কাহাকে ডাকিবে ভাবিয়া পিছন ফিরিয়া দেখে, সুব্রত অলক্ষ্যে আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। অনঙ্গপ্রভা তখন পাখীটির দিকে চাহিয়া বলিল, "যে আমার পাখীটি ধরিয়া আনিয়া দিবে, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।" "যে" বলিতে ত সেখানে সুব্রত একা। সুব্রত তখন কাপড়খানি গুছাইয়া পরিয়া, কিরাতের মত ক্ষিপ্রভাবে এবং নিঃশব্দে গাছে উঠিয়া এডাল ওডাল করিয়া পাখীটি ধরিয়া আনিল। অনঙ্গপ্রভা তখন আনন্দে কম্পিত হস্তে খাঁচা বন্ধ করিয়া পাখীকে অনেক তিরস্কার করিল, কিন্তু সুব্রতকে ভাল মন্দ কিছুই বলিল না। সে যাহাই করুক, সুব্রত একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে অনঙ্গপ্রভা বামহস্তের তর্জনীটি নাকের উপর রাখিয়া এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলি চিবুকের উপর স্থাপন করিয়া, অর্দ্ধ অবনত দৃষ্টিতে হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি তামাসা কচ্ছিলুম; আমি রাজার মেয়ে, আমি কি যাকে তাকে বে কত্তে পারি"? সুব্রত কথা কহিল না; অধোমুখে দাঁড়াইয়া একটি বালপাদপের শাখা ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ করিল। এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে যাইবার জন্য রাজমহিষীর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিল। পিঞ্জরস্থা শারিকা পরিচারিকার হাতে দিয়া বালিকা ছুটিয়া পলাইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শরবিদ্ধ।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন অবরোধ প্রথা ছিল না, শৈশব বিবাহও ছিল না। কিন্তু রাজমহিষী ভাবিলেন যে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে বালকদের সহিত খেলা করা ভাল নয়; এইজন্য অনঙ্গপ্রভাকে সুব্রত আর সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন না। যখনও বা দেখিতে পাইতেন, তখন রাজকুমারী অন্য দশজনের সঙ্গে থাকিতেন। দেখিতে দেখিতে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। বাপ্পাদেব পুত্রকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতেছিলেন; পুত্রও তাহাতে অমনোযোগী ছিলেন না। বরং তিনি সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, সকলেই এই কথা বলিত। কিন্তু এ কথাও প্রকাশ হইল যে, একদিন বাপ্পাদেব তাহাকে একখানি তাল-পত্রে সুরক্ষিত দুর্গ অঙ্কিত করিয়া দিয়া, কি প্রকারে দুর্গ ভেদ করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সুব্রত সেই তালপত্রে মদনদেবকে লক্ষ্য করিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন যে "হে পুষ্পধন্বা! তুমি যদি দুর্গভেদে সহায়তা কর, তবেই সিদ্ধিলাভ করিব।"

সহসা এই সময়ে দক্ষিণ-কোশলের রাজার সহিত প্রবরসেনের একটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। মেখল পর্ব্বতের পশ্চিমে বাকাটক রাজ্য, পূর্ব্বে দক্ষিণ-কোশল; তথাপি সীমা লইয়া বিবাদ উঠিল। কূললঙ্ঘন, রাজবাহিনী ও প্রবাহিণীর প্রাকৃত ধর্ম্ম।

যথোচিত আয়োজনের পর রাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন; সেনাপতি বাপ্পাদেব পুত্রকে লইয়া সৈন্যচালনা করিয়া চলিলেন। সমগ্র

রাজ্যের মধ্যে উৎসাহের স্রোত বহিল। এখন যে রাজ্য কাঁকের নামে প্রসিদ্ধ, যুদ্ধ সেইখানে হইয়াছিল। কলিঙ্গের রাজারা এই যুদ্ধে দক্ষিণ-কোশলেশ্বরের সহায় হইয়াছিলেন বলিয়া, বাকাটকীয়েরা, প্রভৃত বিপক্ষ সৈন্যবলের সম্মুখীন হইতে সঙ্কুচিত হইতেছিল। কাজেই তাহাদের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য রাজা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; এবং বাপ্পাদেব স্বীয় পুত্রকে রাজার পার্শ্বচর করিয়া দিয়া অন্য দিক্ হইতে বিপক্ষীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। রাজাকে লক্ষ্য করিয়া যত শর বর্ষিত হইয়াছিল, সকলই সুব্রতের ক্ষিপ্র হস্তচালনায় অপসারিত হইয়াছিল। যুদ্ধে বাকাটকীয়েরা জয়লাভ করিল; এবং মেখল পর্ব্বতের অরণ্যবিভাগ প্রবরসেনকে দান করিয়া দক্ষিণ-কোশলপতি সন্ধি করিলেন। রাজা, সুব্রতের বীরত্ব এবং যুদ্ধবিদ্যা দেখিয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্যই সুব্রত তাঁহার পার্শ্বচর ছিল বলিয়া, কৃতজ্ঞচিত্তে এবং প্রসন্নমুখে সুব্রতকে বলিলেন, "তোমার যদি কোন প্রার্থনা থাকে, আমাকে বল; আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" সুব্রত অবনতমস্তকে বলিলেন, "মহারাজ! দরিদ্রের প্রার্থনার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আমি আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করি না"। রাজা যখন তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন, তখন পার্শ্বদেশে হস্তসংলগ্ন হওয়ায় সুব্রত কাতরতা সূচনা করিয়া মুখ কুঞ্চন করিলেন। রাজার সন্দেহ হইল; তিনি দেখিলেন, যে সুব্রতের পার্শ্বদেশ অস্ত্রবিদ্ধ। অস্ত্র উত্তোলিত হইয়াছে, ক্ষতস্থান বস্ত্রে বাঁধা আছে; কিন্তু বুঝিতে পারিলেন যে ক্ষত বড় গভীর। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তাহাকে নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন; এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চারি

পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সুব্রত শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং প্রবলবেগে জ্বর আসিল।

তিন চারি দিন চিকিৎসা হইল; কিন্তু জ্বরের প্রকোপ দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং পার্শ্বদেশের ক্ষত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে সুব্রত সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন, এবং চিকিৎসকেরা বলিল যে ব্যাধি দুঃসাধ্য। তখন একজন পরিব্রাজক আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, তিনি একবার রোগীকে দেখিবেন। রাজা তাঁহাকে লইয়া গিয়া রোগীকে দেখাইলেন; এবং বাপ্পাদেব বিষণ্ণভাবে পরিব্রাজকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরিব্রাজক বাপ্পাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কয়টি পুত্র?" বাপ্পাদেব বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দুইটি"। পরিব্রাজক তখন রাজা এবং বাপ্পাদেবকে বলিলেন, "যদি আপনার এই পুত্রটিকে আমার শিষ্যত্বে উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে ইহার জীবনবিধান করি।" পরিব্রাজক হইলেও ত পুত্র জীবিত থাকিবে, এই চিন্তা করিয়া বাপ্পাদেব পরিব্রাজকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং পরিব্রাজক সুব্রতের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সেকালে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ দিত না; কাজেই পরিব্রাজক কি ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে ক্ষতস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল; জ্বর একেবারে চলিয়া গেল; সুব্রত প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বাপ্পাদেব সকল কথা পুত্রকে জানাইলেন; সুব্রত পিতার সত্যপালনের জন্য পরিব্রাজকের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

সুব্রত পরিব্রাজককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে লইয়া আপনি কি করিবেন?" পরিব্রাজক বলিলেন, "আমি আজ আট বৎসর উপযুক্ত

শিষ্যের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। তুমি যখন যুদ্ধযাত্রা করিয়া আসিতেছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পাত্র দেখিলাম, মনে করিয়াছিলাম। ঈশ্বরকৃপায় আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে।" সুব্রত কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর যখন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিলেন, তখন রাজা এবং পিতার চরণবন্দনা করিয়া পরিব্রাজকের সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাখী উড়িয়া গেল।

শীর্ণতোয়া বারদা (Wardah) নদী ধীরে ধীরে বহিতেছে ; এবং নদীগর্ভের বালুকারাশির উপর প্রতপ্ত মধ্যাহ্নসূর্য্য, মহাদেবের অট্টহাস্যের মত প্রদীপ্ত রহিয়াছে। তীরে মহাদেবের মন্দির ; এবং অনতিদূরে রাজা প্রবরসেনের রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের উন্মুক্ত গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজকুমারী অনঙ্গপ্রভা। রাজকুমারী এখন যোড়শী। এখনও যেন সেই আয়ত লোচন-যুগল তেমনি ক্রীড়াশীল ; কিন্তু সে ক্রীড়ায় চপলতা নাই, বরং মনে হয় যেন সেই উজ্জ্বল চক্ষু দুটি অকাল-গাম্ভীর্য্যস্পৃষ্ট। বালিকার আনন্দদায়িনী মূর্ত্তি এখন ভুবনমোহিনী প্রতিমা।

লবঙ্গিকা আসিয়া বলিল, "সই, পাশা খেলিবে চল"। রাজকুমারী সখীর দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, "বড় ঘুম পাচ্ছে, এখন যাব না।" লবঙ্গিকা চলিয়া গেল ; রাজকুমারী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবার গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর খেলা করিবেন

না। মহাদেবের মন্দিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেব-দেব, এই জীবনের খেলা কবে শেষ হইবে? আমি ক্রীড়াচ্ছলে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; সে ধূলিমুষ্টি ভিত্তিচ্যুত অদ্রিশৃঙ্গের মত পতিত হইল! খেলা করিতে করিতে যাতনা দিতাম; আবার খেলা করিয়া চিত্তবিনোদন করিতাম। কিন্তু সেই শেষ দিনে,—আমার জীবনক্রীড়ার সুখের শেষ-দিনে—যাহা করিয়াছিলাম, আর তাহার প্রতিকার করিতে পারিলাম না। আর অবকাশ পাইলাম না। ক্রীড়া করিতে করিতে সুখ হারাইলাম; কিন্তু জীবন রহিল।

এই শীর্ণসলিলা নদীতে আবার বর্ষাধারা বহিবে; জীবনের সুখ কি ফিরিবে না?" বালুকাক্ষেত্র-প্রভাসিত মহাদেবের অট্টহাসি, যেন মানবের সুখ দুঃখের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, দ্বিগুণ প্রদীপ্ত হইল। রাজকুমারী গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া কাঁদিতে বসিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরিচারিকা দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল যে, বেলা অবসান হইয়াছে। রাজকুমারী তখন ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া উদ্যানের দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, তাঁহার আদরের পাখীটি কত কিছু পড়িতেছে। আজি তাহার প্রতি মমতাশূন্য হইয়া রাজকুমারী তাহাকে উদ্যানের মধ্যে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলেন; এবং বলিলেন, "যদি আবার সেই হাতে ধরা পড়িস্, তবে তোকে রাখিব, নচেৎ নহে।" এখনও অনঙ্গপ্রভা বালিকা নয় ত কি? পাখী এমন পোষ মানিয়াছিল যে, উড়িয়া যাইতে চাহিল না। রাজকুমারী সাত আট দিন পরিশ্রম করিয়া উড়িতে শিখাইয়া, পাখায় বলসঞ্চার করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। পাখী উড়িয়া গেল।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ।

রাজকুমারী একদিন মহাদেবের মন্দিরে গিয়া, দেবতার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সুব্রত ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না।

কিন্তু রাজা প্রবরসেন, কন্যাকে সৎপাত্রস্থা করাইবার জন্য চারিদিকে চর পাঠাইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা, যে দক্ষিণপ্রদেশীয় অনার্য্যভাবদুষ্ট কোন রাজপরিবারে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না; সেই জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে অন্যান্য দিকে লোক প্রেরিত হইয়াছিল। মাহেশ্বতীর সৌভাগ্যসূর্য্য তখন অস্তমিত হইয়াছে, গণ্ড বা গৌড় জাতীয়েরা সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়া অনার্য্য রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। বলভীরাজ পঞ্চম শীলাদিত্য বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই তিনি তিনটি বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে রাজা কন্যাসম্প্রদান করিবেন না। অবন্তীর রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর হইতেই সে রাজ্য হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। কানোজরাজ, কাশ্মীররাজ কর্ত্তৃক পরাভব প্রাপ্ত হইয়া, উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরেই মগধের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। দূতেরা চারিদিক হইতে আসিয়া এই সকল সংবাদ দিল। রাজা তখন ভাবিলেন, যাহাকে হউক কন্যা সম্প্রদান করিবেন; আর্য্য অনার্য্যের বিচার করিবেন না। ভারত-গৌরব দিন দিন লুপ্ত হইতে চলিল ভাবিয়া ব্যথিত হইলেন; এবং ব্যথিত অন্তঃকরণে চালুক্য রাজপরিবারে কন্যা সম্প্রদানের কল্পনা

করিয়া পাত্রসন্ধানে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজার চিরপোষিত প্রতিজ্ঞা, আজি ভগ্ন হইতে চলিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

"বসনে পরিণ্সরে বসানা।"

রেবার গদ্গদনাদী বারিরাশি, সহস্রধারায় মর্ম্মরশৈল ভেদ করিয়া, বিন্ধ্যের উপলবিষম পাদতলে প্রবাহিত হইতেছে; এবং একালে যেখানে গৌরীশঙ্করের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানে, রেবার সহস্রধারার অনতিদূরে, প্রশস্ত গিরিগহ্বরে, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত পরিব্রাজক এবং সুব্রত, বহুবিধ বিষয়ের বিচার করিতেছেন। পরিব্রাজক বলিলেন, "সুব্রত! তোমাকে চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করাইয়া দেশের অবস্থা দেখাইলাম; আর্য্য-জাতি, উপনিষদের পবিত্র ধর্ম্ম দূরীভূত করিয়া, কি প্রকারে ধীরে ধীরে অনার্য্য দেবতা এবং অনার্য্য জাতি কর্ত্তৃক পরাভূত হইতেছে, তাহা দেখিতে পাইলে। গৌড় জাতির "লিঙ্গো", এখন আর্য্যের অভিধানে লিঙ্গ শব্দের সহিত মিলিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে মহাদেবে পরিণত হইতেছেন। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু এখন অনার্য্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। অনার্য্যের পৈশাচিক ক্রিয়া এবং শবর জাতির মন্ত্রতন্ত্র, আর্য্যের যোগশাস্ত্রের সহিত মিলিয়া ঘৃণিত তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে। আমার শিষ্যেরা আর্য্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী বলিয়া মনে করি; তুমি এখন কিরূপে দেশের মুক্তিসংকল্পে আপনাকে নিয়োজিত করিবে.

তাহা স্থির কর। তুমি এখন স্বাধীন, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার; কিন্তু তুমি কি করিবে তাহার আভাষ পাইলে সন্তুষ্ট হইতাম।" সুব্রত কহিলেন, "গুরুদেব! ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত; তিনি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন, তাহাই করিব। কিন্তু একটি বিষয়ের তথ্য জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি; যদি বাধা না থাকে, আমাকে জানাইবেন।" পরিব্রাজক সস্নেহে কহিলেন, "যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার।" সুব্রত বলিলেন, "যোগ এবং মন্ত্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে জানিতে ইচ্ছা করি যে, সত্য সত্যই, উহাতে কোন সত্য আছে কি না? যোগবলে ক্ষমতা লাভ হয়, সে কথা কি সত্য?" পরিব্রাজক তখন বলিলেন, "বৎস, কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়ার বলে, এক প্রকারের মানসিক জড়তা এবং ভ্রান্তি জন্মে; তাহাতে লোকেরা প্রত্যক্ষবৎ অনেক স্বপ্ন দর্শন করে, এবং সেই গুলিকেই ক্ষমতালাভ মনে করিয়া অন্ধতমসাবৃত লোকে গমন করে। আমি সেই সকল প্রক্রিয়া জানি; তোমাকেই তাহা দেখাইতেছি।" এই বলিয়া পরিব্রাজক সুব্রতকে গুহামধ্যে শয়ন করাইয়া, অঙ্গে হস্তচালন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সুব্রত সংজ্ঞাশূন্যের মত হইয়া পড়িলেন। পরিব্রাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুব্রত, কি দেখিতেছ?" সুব্রত কহিলেন, "অন্ধকার"। অপর হস্ত সঞ্চালন করিলেন—"কি দেখিতেছ"? সুব্রত নিমীলিত চক্ষে কহিলেন, আহা! অন্ধকার অপসারিত হইতেছে, এবং অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রভাসিত হইতেছে"। পরিব্রাজক আবার তাঁহার শরীরে হস্ত সঞ্চালন করিলেন; এবার সুব্রত আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব! একি দৃশ্য! এই জ্যোতিরাশির মধ্যে সুন্দরী পাষাণময়ী মূর্ত্তি!"

পরিব্রাজক ভাবিলেন, "আমি যখন সুব্রতকে শিষ্য করিয়াছি, তখন সুব্রত বালক বলিলেই হয়; সে বয়সে কোন সুন্দরীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হওয়া, অথবা মনে মনে তাহাকে পাষাণী বলিয়া মনে করা সম্ভবপর হইয়াছে কি?" পরিব্রাজক এবার কৌতূহলী হইয়া আরও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুব্রত মদবিহ্বলের মত কহিতে লাগিলেন, "পাষাণীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে পাষাণ খসিয়া পড়িতেছে, এবং দেবীমূর্ত্তি লাবণ্যময়ী রমণীরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। কি সুন্দর! কে তুমি? কে তুমি? তুমি কি আমার জীবনের আরাধ্যা দেবী? তুমি পাষাণী ছিলে, মনোমোহিনী হইলে কেন? এ আবার কি? অনঙ্গপ্রভা, অনঙ্গপ্রভা! তোমার এ বেশ কেন? "বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী–" কথা কহিতে কহিতে সুব্রতের সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। পরিব্রাজক তাঁহার চৈতন্যবিধান করিয়া সস্নেহে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। কহিলেন, "সুব্রত, তুমি সংসারাশ্রম অবলম্বন কর; এবং পরে যখন ভগবানের প্রেরণা অনুভব করিবে, তখন দেশসেবায় প্রবৃত্ত হইও।" সুব্রত পরিব্রাজকের চরণবন্দনা করিয়া বলিলেন, "আজি আমি একাকী আপনার শিক্ষার উপযোগী কার্য্যে বাহির হইব; আমার স্বপ্ন, স্বপ্নমাত্র।" পরিব্রাজক চিন্তিত মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন; এবং সুব্রত নর্ম্মদাকূলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বসনে পরিধূসরে বসনা"।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বন্দী।

একালের জব্বলপুর হইতে, পার্ব্বত্য পথে, শিওনির মধ্য দিয়া, সুব্রত একাকী নাগপুর পর্য্যন্ত গেলেন। সেখানে একজন বৃদ্ধ পরিব্রাজক তাঁহাকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া আতিথ্য সৎকার করিলেন। সুব্রত সেখানে তিন চারি দিন ছিলেন; এমন সময়ে একদিন মণ্ডলার গোঁড় সৈন্তেরা নাগপুর লুণ্ঠন করিতে লাগিল। দরিদ্রের আর্ত্তনাদে নাগপুর পরিপূর্ণ হইল। সুব্রত দেখিলেন যে নাগপুরের শাসনকর্ত্তা, বাকাটকীয় সৈন্যদলকে অনার্য্যদের দমনের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন না। তখন তিনি শাসনকর্ত্তাকে আত্মপরিচয় দিয়া, সৈন্যদল লইয়া গোঁড় সৈন্য দলটিকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং কার্য্যোদ্ধার হইবার পরই নাগপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। শাসনকর্ত্তা অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ পাইলেন না। সুব্রত দুই তিন দিন বনপথে বহুদূর চলিয়া গেলেন। সম্মুখে অমাবস্যার রাত্রি, সন্ধ্যাও হইয়া আসিল; সুব্রত দ্রুতপদে একটী গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এমন সময়ে চারিজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া বলিল, "তুমি আমাদের বন্দী"। সুব্রত নিরস্ত্র; তাহারা অস্ত্রসজ্জিত। সুব্রত বুঝিলেন যে গোঁড়েরা অবৈধ উপায়ে তাঁহাকে বন্দী করিতেছে। কোন কথা না কহিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তাহার পর তিনি নৈশ অন্ধকারে অবরুদ্ধ শকটে কোথায় নীত হইতে লাগিলেন, বুঝিতে পারিলেন না। শকটখানি অতি দ্রুত চলিতেছিল। সমস্ত রাত্রি সুব্রতের নিদ্রা হয় নাই। কোথায়

আসিয়া প্রভাত হইল, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু অবরুদ্ধ শকটে বসিয়াও বুঝিলেন যে প্রভাত হইয়াছে। প্রভাত হইবার পরেও শকটখানি আবার দ্রুত চলিল ; কিন্তু এবার অল্প দূরে গিয়াই থামিল। লোক কোলাহলে বুঝিতে পারিলেন, কোন নগরে প্রবেশ করিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একাকী শকটে বসিয়াছিলেন ; তাহার পর কে একজন আসিয়া বলিল :—"বন্দী, তুমি বাহিরে আসিতে পার"। শকটের আববরণ উন্মুক্ত হইল ; বন্দী দেখিলেন তিনি প্রবরপুরের রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে। স্বয়ং রাজা প্রবরসেন এবং বাপ্পাদেব প্রাসাদ-সোপানে দণ্ডায়মান ; এবং তাঁহাদের পশ্চাতে মুক্ত দ্বারপথে অনঙ্গপ্রভা ; এবং তিনি সত্যসত্যই "বসনে পরিধসরে বসানা"। সুব্রত শকট হইতে অবতরণ করিতে না করিতে দেখিলেন, তাঁহার গুরু পরিব্রাজক স্নান শেষ করিয়া রাজ-প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বিস্ময়ের কারণ দূর হইল : সুব্রত সকল কথাই বুঝিতে পারিলেন।

পরিশিষ্ট।

অনঙ্গপ্রভা এবং সুব্রত সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রাসাদসন্নিকটস্থ উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটি পাখী আসিয়া সুব্রতের কাছে উড়িয়া পড়িল। সুব্রত কৌতুক পরবশ হইয়া সেটীকে ধরিয়া অনঙ্গপ্রভাকে দিলেন। অনঙ্গপ্রভার চক্ষু দিয়া জল পড়িল ; তিনি বলিলেন,"এই পাখিটী আমার সেই পোষা পাখী; তুমি না ধরিয়া দিলে উহাকে আর রাখিব না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।"

লজ্জাবতী।

প্রথম অধ্যায়।

শুভচিহ্ন।

ঋষ্যমুক পর্ব্বতশ্রেণীর পাদতলে, অসংখ্য নির্ঝরিণীপরিবর্দ্ধিতা চিত্রোৎপলা, রামায়ণপ্রসিদ্ধা সিদ্ধশবরীর আশ্রমগুহা ধৌত করিয়া, প্রবাহিত হইতেছিল, এবং তীরস্থিত শৈল-পরিব্যাপী সুবিস্তীর্ণ বিশাল অরণ্য, চিত্রোৎপলা বা মহানদীর স্ফটিক স্বচ্ছজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। একদিন সেই নদীকূলে উন্মুক্ত আকাশতলে বসিয়া রাজা অদ্রিদেব, বায়ু সেবন উপলক্ষ্য করিয়া, নানা চিন্তা করিতেছিলেন। এই হৈহয় বংশীয় রাজা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ঠিক এই সময়ে বঙ্গীয় রাজকুলতিলক দেবপাল, বঙ্গের সিংহাসনের গৌরববর্দ্ধন করিতেছিলেন। রাজা দেবপাল স্বীয় ভ্রাতা জয়পালের বাহুবলে, উত্তরে হিমাচল, পশ্চিমে কানোজ, দক্ষিণে কলিঙ্গ, এবং পূর্ব্বে সুহ্মদেশ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তৃত করিয়া, দক্ষিণ কোশল এবং

মেকল প্রদেশ করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই জন্যই অদ্রি-দেব বিজনে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, যে কি উপায়ে এই পরাক্রান্ত রাজার আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবেন। অদ্রিদেবের রাজধানী রাজিমে ছিল। অদ্রিদেব চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি শর, ঊর্দ্ধদেশ হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার মত, তাঁহার সম্মুখভাগে মৃত্তিকায় দৃঢ় প্রোথিত হইল। রাজা সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে আর একটি শর তাঁহার দক্ষিণভাগে আসিয়া ভূমিতে প্রোথিত হইল। বিস্ময় বাড়িল; রাজা গ্রীবা হেলাইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সহসা তৃতীয় শর তাঁহার নাসিকাগ্রের এক অঙ্গুলি ব্যবধান দিয়া অতি দ্রুতবেগে গিয়া একটি আম্রশাখায় বিদ্ধ হইল। রাজা তখন স্থির পাদবিক্ষেপে একটু দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন একটি গোঁড় যুবক হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে "জুহর" (প্রণাম) করিয়া দাঁড়াইল। রাজা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চানাহু, তীরগুলি কি তুমি "ছুঁড়িতেছিলে?" চানাহু আবার জুহর করিয়া বলিল, "হাঁ"। রাজা বলিলেন, "এ খেয়াল চাপিল কেন?" চানাহু গম্ভীর হইয়া বলিল, "মহারাজ, দেবীর প্রসাদে আগামী যুদ্ধে আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের মঙ্গল হইবে। তীর ছুঁড়িয়া তাহার দৈব পরীক্ষা করিলাম।" কোন সংস্কার আমাদের থাকুক বা নাই থাকুক, মনের মত কথা বলিলে, সেটা মানিতে ইচ্ছা করে। রাজা প্রসন্ন হইলেন। চানাহু তাহা বুঝিল; এবং আবার জুহর করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উদ্যোগ।

চানাহুর কথা বলিয়াছি; এবার তাহার রূপ বর্ণনা করিব। সেই সুপুষ্ট নিটোল মাংসল দেহ, সেই মিস্‌মিসে কাল রং, সেই প্রফুল্ল চিন্তাশূন্য উজ্জ্বল চক্ষু, কিসের সহিত তুলনা করিব? পাহাড়ের পাদদেশে, অরণ্যবেষ্টিত অথচ সূর্য্যদীপ্ত কাল জল ভরা সরোবর দেখিয়াছ? চানাহু সেই সরোবরের মত সুন্দর। পাথর ঠেলিয়া, লতা পাতা ছিঁড়িয়া, নির্ঝর বহে; চানাহু সেই নিঝরের মত সুন্দর। কখনও গজ শাবকের সৌন্দর্য্য অনুধ্যান করিয়াছ? চানাহু গজ শাবক তুল্য মনোহর। চানাহু বলিল, "আমি অল্প দিনেই রাজার সঙ্গে গিয়া যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিব; তুই কাঁদিস্‌নে।" চানাহু অভিমন্যু অপেক্ষা বয়সে বড়; এবং যে কাঁদিতেছিল, সেও উত্তরা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা; বয়স প্রায় ১৭ বৎসর। পহিলী, জলভরা চোখে চানাহুর মুখের দিকে তাকাইয়া, দুহাতে তাহার বাঁ হাত খানি টানিয়া ধরিল। চানাহু ডাইন হাতখানি দিয়া, পহিলীর পীঠে হাত বুলাইতে লাগিল। চানাহু সুন্দর; পহিলী আরও সুন্দর। সেই মাংসল দেহ, সেই কৃষ্ণবর্ণ, সেই স্বচ্ছতা। উপরন্তু সেই নির্ম্মল চক্ষু, জলভরা; উপরন্তু সেই অনার্য্যোচিত নগ্ন বক্ষে স্বাস্থ্য এবং মাধুরীর তুঙ্গলীলা। এবং উপরন্তু আরও কিছু, যাহা পুরুষের চক্ষে, মোহ, দীপ্তি এবং শান্তি।

অরণ্য সুন্দর; কিন্তু আরণ্য জাতি কখনও সুন্দর বলিয়া খ্যাতিলাভ করে নাই। কাজেই সুসভ্য পাঠকদের নিকটে একথা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিব না।

চানাহু একজন সাধারণ সৈন্য মাত্র; তবে রাজার প্রিয়পাত্র। আজি অপরাহ্নে, দক্ষিণ কোশলের সৈন্যগণ, শুভ মুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রা করিবে। সংবাদ আসিয়াছে, যে স্বয়ং রাজা দেবপাল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ জয়পাল, কোশল অধিকার করিবার জন্য, অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। চানাহু ধনুর্ব্বাণ লইয়া রাজসৈন্যের সঙ্গে যোগ দিতে গেল; এবং পহিলী, সেই কাল পহিলী, আরণ্য কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মায়া মৃগ।

রাজিম হইতে দুই ক্রোশ দূরে মহানদীতটে, করকা নামক প্রান্তরে একটি আম্রকাননে, রাজা দেবপাল দেবের সৈন্যগণ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, এবং রাজা পত্ররচিত শিবিরে বসিয়া, জয়পাল এবং জয়পালের পুত্র বিগ্রহ-পালের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময়ে বৈতালিকেরা স্তুতি-গান করিতে আরম্ভ করিল।

তাহারা গাহিলঃ---

দেবপাল নৃপমণ্ডল মণ্ডণ!
আশ্রিত সেবকজন চিত রঞ্জন!
অরিকুল দুর্দ্ধর! ভীম ভয়ঙ্কর
কৃতান্ত সম তুমি সমরে।
বীর্য্য-নিকেতন! তব জয়-কেতন
শোভে হিমগিরি শিখরে

অর্ণব পথ বহি বহিত্র যতনে
কত ধন সম্পদ অর্পে চরণে।
চুম্বি চরণ তব সাগর ভৈরব
মাগধ সমান বন্দে।
অরাতি বর্গ হিরণ্য অর্ঘ
ঢালে চরণ উপান্তে।
প্রোথিত বঙ্গে কীর্ত্তিস্তম্ভ ;
অবনত অঙ্গ, পদাশ্রিত সুহ্ম ;
মগধ, কনোজে, অনার্য্য রাজ্যে
লব্ধ সুবিস্তৃত সীমা।
কলিঙ্গ, উৎকল, কোশল, মেকল,
গাহে তব যশ মহিমা।*

বৈতালিকের গীতির উত্তেজনা, সময়োপযোগী হইয়াছিল। রাজা, বিগ্রহপালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এরাজা পরাজিত হইলে, অচিরাৎ সমগ্র ভারত আমার করায়ত্ত হইবে ; এবং তুমি ভারতের একাধীশ্বর রাজা হইবে।" দেবপাল নিঃসন্তান ছিলেন ; সেই জন্য বিগ্রহপালকে উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। বিগ্রহপাল, অবনত মস্তকে অনুগ্রহ স্বীকার করিলেন।

সহসা চতুর্দ্দিক হইতে শরপাত হইতে লাগিল। কোথাও শত্রু-সৈন্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল না ; অথচ শরপাতে রাজশিবির বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। জয়পাল এবং তাঁহার সৈন্যগণ সম্মুখ-সমরে পরাক্রান্ত ;

* এই কবিতাটি হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পঠিতব্য।

কিন্তু এপ্রকার লুক্কায়িত যুদ্ধে তাঁহারা অনভ্যস্ত। বিশেষ, সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে ; এসময়ে শত্রুর অনুসন্ধান সুসাধ্য নহে। রাজা দেবপালের অনুমতি লইয়া, জয়পাল আদেশ করিলেন, যে শিবির পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যেরা তাঁহার নির্দ্দেশ মত অরণ্যে এবং পাহাড়ে লুকাইয়া থাকুক। বিগ্রহপাল, অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া, প্রচ্ছন্নভাবে মহানদীর কূল দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; রাজা নিজেও তেমনি ভাবে একটি পাহাড় লক্ষ্য করিয়া চলিলেন ; জয়পাল, একজন মাত্র অনুচর লইয়া একটি অরণ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন ; এবং অন্যান্য সৈন্যেরাও গুপ্তভাবে যথানির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। সেই গাঢ় অন্ধকারে জয়পালের মনে হইল, যে কে যেন ক্ষিপ্রপদে তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। জয়পাল, অতি সতর্কভাবে তাহার পদানুসরণ করিয়া ছুটিলেন। কিছু দূর গিয়া একটা ক্ষুদ্র জঙ্গলের নিকটে, যেন অগ্রগামীর পদশব্দ থামিল বলিয়া মনে হইল। জয়পাল অনুচরকে ইঙ্গিত করিয়া, ক্ষুদ্র জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইলেন ; এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ২০।২৫ জন সৈন্য আসিয়া জঙ্গলটি ঘিরিয়া দাঁড়াইল। জয়পাল সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা সমস্ত রাত্রি এখানে থাক ; দেখিও, কেহ যেন জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া না পালায়।" কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্রোদয় হইল। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও, রাত্রিকালে সেই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করা উচিত নহে মনে করিয়া জয়পাল, সৈন্য লইয়া জঙ্গল বেষ্টন করিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে সেই জঙ্গলের মধ্য হইতে একটি রমণীর চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। স্ত্রীলোকটি কাঁদিয়া কহিল, "আমাকে রক্ষা কর"। তখন রোদনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া, তিন চারি জন অনুচর লইয়া, জয়পাল

জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন একটি আরণ্য যুবতী ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। জয়পালকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিল যে, একজন দস্যু তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া পলাইয়াছে। রমণীর প্রতি অত্যাচার, বীরের হৃদয়ে অসহ্য। জয়পাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যু কোন্ দিকে গিয়াছে ?" যুবতী একটি দিক লক্ষ্য করিয়া বলিল, "অধিক দূর যাইতে পারে নাই ; আমার সঙ্গে একটু অগ্রসর হইলেই তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিব।" জয়পাল অনুচর লইয়া যুবতীর সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। একটু অগ্রসর হইবামাত্রই, বালিকা অঙ্গুলি তুলিয়া বলিল, "ঐ"। জয়পাল দেখিলেন, একজন লোক চুপে চুপে গাছের আড়াল দিয়া পালাইতেছে। নিজে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। অনুচরেরাও ছুটিল : এবং যাহারা জঙ্গল ঘিরিয়াছিল, তাহারাও জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে দস্যু কোথায় পালাইল ? সে যুবতীই বা কোথায় গেল ? জয়পাল অনেক অনুসন্ধানের পর একটু ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন : এবং তখন দেখিলেন, তিনি অসংখ্য গৌড় সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছেন। দূরে একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া, পহিলা চানাহুকে বলিল, "আমি না আসিলে, এত বড় শীকার কত্তে পাত্তে কি ?" চানাহু পহিলীর মুখচুম্বন করিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

দ্বিতীয় বন্দী।

রাজা দেবপালদেব প্রভাতে সংবাদ পাইলেন যে, জয়পাল বন্দী হইয়াছেন। অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা বৃথা মনে করিয়া তিনি আত্ম-

সমর্পণ করিয়াছেন, এবং গৌড়েরা তাঁহাকে রাজিমে লইয়া গিয়াছে। আরও সংবাদ আসিল যে, জয়পাল বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া, বিগ্রহপাল একাকী ছদ্মবেশে, কোশল অধিকার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, পথের তত্ত্ব লইতে চলিয়া গিয়াছেন। রাজা চিন্তাকুল হইলেন। হৈহয়পতি বা চেদিপতি বা কোশলেশ্বরের সৈন্যেরা আর কোন উপদ্রব করিল না। রাজা দেবপাল সৈন্যদল লইয়া যেখানে ছিলেন, সেই খানেই রহিলেন; এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুমার বিগ্রহপাল সমস্ত দিন পরিভ্রমণ করিয়া অপরাহ্ন সময়ে শ্রান্তপদে, মহানদীর বিজনকূলে শৈলাসনে উপবেশন করিলেন। দুঃখের দিনেও প্রকৃতির রমণীয়তা মনমোহন করে। চিত্রোৎপলার অপরাহ্ন সূর্য্যকিরণ-চুম্বিত, গিরি-গগন-বিম্বিত, নির্ম্মল জলধারা; শ্রেণীবদ্ধ শৈলমালার প্রশান্ত স্নিগ্ধশ্যামলকান্তি, হাস্যময়ী দিগধর প্রসন্ন রূপচ্ছবি, কুমারের নয়ন মন বিমোহিত করিল। তাহার উপর আবার বসন্তে মলয় সমীরণের মত, শরতে চন্দ্রিকাদীপ্তির মত, সেই শোভার উপর নবশোভা ফুটিয়া উঠিল। কুমার দেখিলেন, তিনটি যুবতী চিত্রোৎপলার স্রোতজলে ক্রীড়া করিতেছেন। দুইটি যুবতী কাল; সম্ভবতঃ অনার্য্য-জাতীয়া। আর তৃতীয়টি? কূলভরা যৌবন, গালভরা হাসি, অর্দ্ধসুপ্তিময় চক্ষু, পূর্ণদীপ্তিময় লাবণ্য। আমি যখনই স্বচ্ছজলে আকাশের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি যে, স্বচ্ছ আকাশেও জলের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। কি করিয়া সম্ভব হয় জানি না, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিলাম। সৃষ্টির আদি হইতে চারি চক্ষু মিলনের কথা চলিয়া আসিয়াছে। এখানেও তাহাই হইল। দুইটি হৃদয়ে দুইটি হৃদয়ের

প্রতিবিম্ব পড়িল। "আর গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা নাই; কে তুমি?" উভয়ের নয়নে নয়নে নিঃশব্দে ওই কথা হইল। যুবতী কতক্ষণ ছিলেন, চলিয়া যাইবার সময় পাথরে আঁচল বাধিয়াছিল কি না, সঙ্গিনীরা কিছু আঁচ পাইয়া পরিহাস করিয়াছিলেন কি না, এ সকল কথা লিখিবার অবসর হইল না। যুবতীগণ গৃহে চলিয়া যাইবার পর, কুমার যখন নদীকূল দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন চারি পাঁচ জন কোশল সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। অসভ্য কোশলসৈন্যগণের বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া কুমার বিস্মিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

যুদ্ধ।

জয়পাল বন্দী, কুমার বিগ্রহপাল বন্দী। রাজা দেবপাল দেব, তখন বীরোচিত দর্পে সৈন্যদল লইয়া, রাজিম আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। যাহারা সম্মুখযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল, তাহারা স্রোতমুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। আকাশ ছাপিয়া, সৈন্যের জয়হুঙ্কার উত্থিত হইতে লাগিল, এবং ভাটেরা গাহিতে লাগিল, "দেবপাল নৃপমণ্ডলমণ্ডণ"। বঙ্গের সে গৌরবের দিন আর ফিরিবে না; কিন্তু আজিও তাহার স্মৃতি বড় সুখময়। হৈহয়পতি অদ্রিদেব, সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইলেন। বলিলেন, তিনি বন্দীদিগকে ফিরাইয়া দিবেন, এবং রাজোচিত উপহার দান করিবেন। এ কথা বলিলে হিন্দুরাজারা কদাপি যুদ্ধ করিত না। দেবপাল স্বীকৃত হইলেন।

অপরাহ্ণে রাজিমে বিস্তৃত সভামণ্ডপ রচনা করিয়া, হৈহয়পতি, বঙ্গেশ্বরকে আহ্বান করিলেন। বঙ্গেশ্বর সগর্ব্বে সভাপ্রবেশ করিলেন। তিনি সভাপ্রবেশ কবিবার সময়ে, চানাক্ষ্য তাঁহাকে কি যেন কানে কানে বলিতেছিল। দেবপাল দেব, জয়পাল এবং বিগ্রহপাল, যথানির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইবার পর, হৈহয়পতি, দেবপালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি কিছু উপহার দিব বলিয়াছিলাম; এই সভা মধ্যেই তাহা অর্পণ করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি।" রাজার ইঙ্গিতে, পরিচারিকা-পরিবৃতা রাজকুমারী, সভা মধ্যে আনীতা হইলেন। বিগ্রহপাল দেখিলেন তিনিই তাঁহার হৃদয়মোহিনী। হৈহয়পতি বলিলেন, "আজি আমার কন্যাটিকে ভাবী বঙ্গেশ্বরের পত্নীত্বে সম্প্রদান করিতেছি।" দেবপাল দেব, আসন হইতে উঠিয়া, কুমারের এক হস্ত তুলিয়া ধরিলেন; অমনি অদ্রিদেব, কুমারী লজ্জাবতীর অপর হস্ত আনিয়া তাহাতে সম্বদ্ধ করিলেন। পুরোহিত পুষ্পমালা বাঁধিয়া দিলেন এবং পুরনারীগণ মঙ্গলধ্বনি করিলেন।

কানিংহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, পালরাজাদের মুদ্রায় দেখা যায় যে, বিগ্রহপালের সহিত হৈহয়পতির দুহিতা লজ্জার বিবাহ হইয়াছিল। মুদ্রায় নামটি লজ্জা বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও, লজ্জাবতী বলিয়া লিখিলাম।
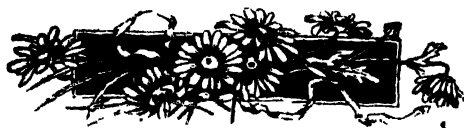
কঞ্চুকা।

প্রথম অধ্যায়।

রাজনীতি।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা গণনা করিয়াও শেষ করা যায় না। স্বার্থপর, হীনবল ও বিলাসপরায়ণ রাজারা যে যাহার আপনার রাজ্যে নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিলেন, এবং সুবিধা পাইয়া মুসলমানেরা ধীরে ধীরে পঞ্জাব সীমান্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চন্দেল্ল-বংশীয় বাহিল রাজার পুত্র হর্ষদেব বুন্দেলখণ্ডের রাজা। আর্য্যই হউন, অনার্য্যই হউন, হর্ষদেবের স্বদেশানুরাগ ছিল। কি করিলে ভারতবর্ষ বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, সর্ব্বদাই তাহার উপায়-উদ্ভাবনে ব্যগ্র ছিলেন। সীমান্তপ্রদেশগুলি সুরক্ষিত করিতে হইলে দেশের সমগ্র রাজবল একত্রে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এই জন্য তিনি বিভিন্ন

প্রদেশের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

ভারতবর্ষ তখন ক্ষীণপুণ্য; মানবচেষ্টায় তখন তাহার উদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। যোদ্ধা ও পণ্ডিতদিগকে লইয়া হর্ষদেব অপরাহ্নসময়ে সভা করিয়া বসিলেন; অমনই ভাটেরা তাঁহার বংশের গান আরম্ভ করিল। রাজা ভাটদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "আমি এই ক্ষুদ্র বুন্দেল-খণ্ডের শাসনকর্ত্তা মাত্র, আমাকে অযথা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়া অপমান করিও না।"

রাজার আদেশে বিভিন্ন রাজ্য হইতে প্রত্যাগত দূতেরা একে একে আসিয়া রাজবর্গের অভিমত জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কানোজ-প্রত্যাগত দূত কহিল, "মহারাজ, কানোজ-পতি মহেন্দ্রপাল দেব, তাঁহার গুরু ও সভাপণ্ডিত কবিরাজশেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং উহার শিরোভাগে স্বহস্তে আপনার প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া দিয়াছেন।" রাজা গ্রন্থখানি লইয়া দেখিলেন, যে, লিখিত আছে, "কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালং গচ্ছতি ধীমতাম্।" রাজা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া মাথা নাড়িলেন। দ্বিতীয় দূত রাজার চরণতলে একখানি লিপিস্থাপন করিলেন। রাজা স্বয়ং তাহা পড়িয়া দেখিলেন যে, চেদিকুলের কলচুরিবংশীয় মুগ্ধতুঙ্গ-প্রসিদ্ধ-ধবল তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে, "তিনি নিজে পরাক্রান্ত ও বাহুবলসম্পন্ন। ম্লেচ্ছ যবনদিগকে অনায়াসে দূরীভূত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে; তিনি অন্য রাজার সহিত দলবদ্ধ হইয়া আত্মগৌরব হীন করিতে চাহেন না।" হর্ষদেব মন্ত্রীকে বলিলেন যে, "ইহাকেই বিপত্তিকালের বিপরীত বুদ্ধি বলে।" ক্ষুদ্র কোশল-রাজকে পরাস্ত করিয়া এবং পূর্ব্ব সমুদ্রকূলের

দুর্ব্বল রাজাদিগকে জয় করিয়া, কলচুরি রাজা অতি গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই সময়ে চোলরাজ্যে বীরনারায়ণ বা পরান্তকদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কেরল-রাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়া, অংশতঃ কেরলপতির সাহায্যে পাণ্ড্য রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কা পর্য্যন্ত জৈত্রযাত্রা করিয়া তত্রত্য রাজা পঞ্চম কস্সপকে (কাশ্যপ) একবার পরাভূত করিয়াছিলেন। হর্ষদেবের বিশ্বাস ছিল যে, বীরনারায়ণ সমগ্র দক্ষিণপ্রদেশের একাধীশ্বর হইতে পারিবেন। এই জন্য তাঁহার বিজয়-বার্ত্তায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া আপনার অভিমতি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পরান্তকের পত্রে কেবল এই কয়েকটি কথা ছিল; "উত্তর ভারত বহুদূরে।" হর্ষদেব সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি নিজেই একবার অন্যান্য নিকটবর্ত্তী রাজাদিগের মন বুঝিবেন; তাহার পর যাহা হউক, একটা কিছু অনুষ্ঠান করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রগল্‌ভা।

লূনীর জল বড় নির্ম্মল, বড় শীতল। অজমীর প্রদেশে এখন যেখানে তারাগড়, উহার দক্ষিণ দিক দিয়া এক সময়ে লূনী নদীর ধারা বহিয়া যাইত। সেই সময়ের কথাই বলিতেছি। অতি প্রত্যূষে নদীর শীতল জলে অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া, কুমারী কঞ্চুকা দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। একালের রুচিতে কঞ্চুকা নামটা ভাল লাগিবে না; কিন্তু কবিত্বপ্রিয় পাঠকদিগের খাতিরে ঐতিহাসিক নামের পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব।

নামটা যেমনই হউক, কুমারী হয় ত খুব সুন্দরী। কেন না, তিনি দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্রই, এক জন সৌম্যমূর্ত্তি যুবক সন্ন্যাসী তাঁহাকে দর্শন করিয়া, দেবপূজার মন্ত্র ভুলিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিলেন,—

কনককমলকান্তৈঃ সদ্য এবাম্বুধৌতৈঃ
শ্রবণতটনিষক্তৈঃ পাটলোপান্তনেত্রৈঃ
উষসি বদনবিম্বৈরংসসংসক্তকেশৈঃ
শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা যোষিতোঽস্য। (১)

এই সময়ে অজমীরে নূতন চাহমান বা চোহান বংশের রাজত্ব চলিতেছিল। রাজা গোবক্কের পুত্র চন্দন তখন সিংহাসনে। কুমারী কঞ্চুকা রাজা চন্দনের সহোদরা।

সুন্দরী,দেবপদে অঞ্জলি প্রদান করিয়া সন্ন্যাসীর চরণতলে মস্তক অবনত করিলেন। সন্ন্যাসী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমি আপনার প্রণামগ্রহণের অযোগ্য; বিশেষতঃ, এই মন্দিরের মধ্যে দেবতা ভিন্ন অন্য কেহ নমস্য নহেন।" কথা কি কেবল কণ্ঠের গুণেই মিষ্ট হয়? সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতে কাহারও বাধা নাই; কুমারী সস্মিতবদনে কহিলেন, "স্বয়ং চাহমান-পতি আপনার ভক্ত; তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী আপনাকে

---

(১) সদ্যস্নাতা কামিনীর দেহের শোভা সুরুচির;
বিলম্বিত কেশপাশ, অংসতল শোভিল;
পাটল উপান্তসম, আঁখি দুটি মনোরম,
আকর্ণবিশ্রান্ত মরি, কিবা শোভা ধরিল।
কনককমল সম, এ যে মুখ নিরুপম;
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন গৃহমাঝে বসিল।

প্রণাম করিলে ক্ষতি হইবে কেন ?” সন্ন্যাসী এই পরিচয় পাইয়া প্রসন্ন হইলেন, মনে হইল।

কুমারী হয় ত একটু প্রগল্‌ভা ; কিন্তু তাঁহার চক্ষু ঢুটি মুগ্ধার চক্ষু। সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া কথা কহিবার সময়, পাতা ছ'খানি যখন ঈষৎ উর্দ্ধে উঠিয়াই সুকোমল দৃষ্টিটুকু ঢাকিয়া অবনত হইল, তখন সন্ন্যাসীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সন্ন্যাসী দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণটি প্রাচীন বক্ষোগৃহ ছাড়িয়া, যুবতীর ঈষন্মুক্ত দৃষ্টিপথ দিয়া সৌন্দর্য্যের নবমন্দিরে প্রবেশ করিল। মনোমোহিনী যদি চক্ষুর পাতা ছ'খানি আবার উন্মুক্ত করিয়া চাহিতেন, তথাপি পলাতক প্রাণটা ফিরিয়া আসিত কি না সন্দেহ।

ইহার পর হইতেই কুমারীর দেবভক্তি বাড়িয়া উঠিল। তিনি ছ' বেলা মন্দিরে আসিতেন ; এবং কখনও কখনও পরিচারিকা লইয়া আসিতেও ভুলিয়া যাইতেন। একদিন সন্ন্যাসী মন্দিরসোপানে বসিয়া বামকরে চক্ষু আবৃত করিয়া মানস-পূজায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কুমারী মৃদুপদে নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। সায়াহ্নের আরতির জন্য তখনও দেবমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল ; তিনি নম্রস্বরে কুমারীর কুশলপ্রশ্ন করিলেন। কুমারী কহিলেন, “আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব ; এবং আপনার শিষ্যা হইব।” কুমারী বড় প্রগল্‌ভা। তাহার পর উভয়ে কি কথোপকথন হইল, বলা দায়। কিন্তু মন্দিরের দ্বার মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই হৃদয় ছুইটি মুক্ত হইয়াছিল।

উহার পরদিন সন্ন্যাসী রাজসভায় প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি ঘটক হইয়া কুমারী কঞ্চুকার সহিত বুন্দেলখণ্ডপতি হর্ষদেবের বিবাহসম্বন্ধ করিবেন। রাজা স্বীকৃত হইলেন ; এবং সন্ন্যাসী, লুনীর জলে স্নান

আহ্নিক সম্পন্ন করিয়া অজমীর পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কথাটা মনে রহিল যে, লুনীর জল বড় নির্ম্মল, বড় শীতল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সমরক্ষেত্রে।

সন্ধি স্থাপিত না হইলে যুদ্ধ করিতে হয়, ইহা চিরকালের নীতি। চান্দেল্ল-পতি হর্ষদেব, বুন্দেলখণ্ডকে ভারতের কেন্দ্র করিবেন বলিয়া ক্ষুদ্র রাজাদিগের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিবিধ স্থানে জয়লাভ করিবার পর চেদিবংশীয় কলচুরি রাজাদিগের সহিত সমর আরম্ভ হইল। গর্ব্বদীপ্ত মুগ্ধতুঙ্গ-প্রসিদ্ধধবল তখন পরলোকে; এবং তাঁহার পুত্র বালহর্ষ তখন রাজা। মধ্যপ্রদেশে এখন যেটা সগর জেলা, উহা চেদিরাজ্যের প্রধান স্থান ছিল। সগর জেলার উত্তরে ও বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ সীমায় সাহগড়ে উভয় পক্ষের সংগ্রাম হইয়াছিল।

যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বাহ্ণে একদিন দেবীপূজা করিবার পর রাণী কঙ্কা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মূর্চ্ছাপন্না হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন যে, রাজা যেন একখানি আলোকরঞ্জিত মেঘস্তরে উপবেশন করিয়াছেন, এবং তিনি রাজার পাদস্পর্শের জন্য যতবার হস্তপ্রসারণ করিতেছেন, ততবারই সিংহাসনখানিতে বাধা লাগিতেছে। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর রাণী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সমর ক্ষেত্রেও স্বামীর নিকটে উপস্থিত থাকিবেন। রাজা অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাণী তাহা শুনিলেন না। তিনি একটু হাসিয়া রাজাকে বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর! চহমানের

মেয়ে যুদ্ধ দেখিয়া ভয় পায় না।" রাণী রাজাকে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেন।

সাহগড়ে সৈন্যকোলাহল ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফাল্গুনের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন মধ্যাহ্নসময়ে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল; সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, তবুও কোনও পক্ষ নিরস্ত হইল না। সহসা রাণীর মনে কেমন একটা উৎকণ্ঠা জন্মিল, কোনও ক্রমে তিনি শিবিরে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যগ্র হইয়া যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন; এবং শিবিরস্থিত ৫০ জন পদাতিক লইয়া, 'জয় চন্দেল্লপতির জয়!' বলিয়া পার্শ্বদেশ হইতে শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। রাত্রিকালে নূতন সৈন্যের আগমনে পরিশ্রান্ত কলচুরি সৈন্যদল রণে ভঙ্গ দিতে লাগিল; এবং 'মার মার!' শব্দে বুন্দেলখণ্ডের সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

রণজয়ের পর রাজা ও রাণী একত্র প্রত্যাগমন করিলেন। রাণীর আদেশে অবিলম্বে জ্যোৎস্নালোকে মুক্ত আকাশতলে শয্যা প্রস্তুত হইল; সমরসজ্জা পরিত্যাগ না করিয়াই রাজা সেখানে শয়ন করিলেন। রাণী রাজার পার্শ্বে উপবেশন করিবামাত্রই বৈদ্য আসিলেন; কিন্তু রাজা স্থির-ভাবে বলিলেন, "চিকিৎসায় কোনও ফল হইবে না।" তবুও রাণীর অনুরোধে, বৈদ্য, রাজার ক্ষত বক্ষঃস্থলে ঔষধলেপন করিলেন; এবং রাণী স্বহস্তে ঔষধ পান করাইয়া পতির মুখচুম্বন করিলেন।

হর্ষদেব পত্নীর করধারণ করিয়া বলিলেন, "একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে; তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে, আমার চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিবে না।" দেবী অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দেবতা, রমণীজন্মের যথার্থ সুখটুকু হইতে আমাকে কি অপরাধে বঞ্চিত করিবে?" রাজা বাহুবেষ্টনে

রাণীর কোমল কণ্ঠ ধরিয়া কহিলেন, "দেবী, দেবদত্ত জীবন আত্মহত্যায় নাশ করিবার কাহারও অধিকার নাই। সুখের আশা পরিত্যাগ কর; দুঃখ বহন কর। উহাই জীবনের যথার্থ গৌরব। যে মন্ত্রে লুনীতীরে আমরা দীক্ষিত হইয়াছিলাম, সেই মন্ত্রে বালক যশোবর্ম্মাকে দীক্ষিত কর পুত্রের জননী হইয়া আমার কামনা পূর্ণ করিবার জন্য জীবনধারণ কর।" রাণীর আদেশে পুত্র যশোবর্ম্মাকে আনিবার জন্য অশ্বারোহী ছুটিল।

পরিশিষ্ট।

এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় সংগৃহীত লিপি হইতে পাঠকেরা জানিতে পারিবেন যে, রাজার কামনা ও রাণীর সাধনা বহুপরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যশোবর্ম্মা মাতার নিকট যুদ্ধদীক্ষা গ্রহণ করিয়া, গৌড়, খস, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেদী, কুরু ও গুর্জর জয় করিয়াছিলেন।

তিব্বত (ভোট) রাজার নিকট হইতে কানোজ-রাজ একটি দেবমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, উহা কৈলাস হইতে আনীত বলিয়া প্রবাদ আছে। ৯৪৮ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মা কানোজ হইতে ঐ দেবমূর্ত্তি আনিয়া বৈকুণ্ঠ নামক একটি মন্দির গড়িয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। পিতামাতার বৈকুণ্ঠকামনায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
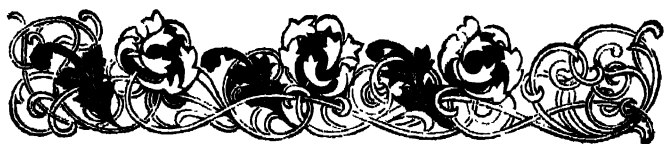
অনুতাপ।

(১)

প্রমথনাথ বড়মানুষের ছেলে; নিবাস শ্রীপুর নামক একটি পল্লীগ্রামে। তিনি কলেজ-শিক্ষার অনুরোধে কলিকাতাপ্রবাসী। নিরভিমানী, সরলচিত্ত এবং বিদ্যানুরাগী বলিয়া এই ধনী সন্তানের বন্ধুত্বলাভের জন্য, সহাধ্যায়ীরা সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

মিষ্টার মিটার, জাতিতে বিলাত-ফেরত; তাহার পুত্র উইলি মিটার, প্রমথনাথের সহপাঠী। উইলির সহিত প্রমথনাথের ঘনিষ্ঠতা জন্মিল; এবং প্রমথনাথ উইলির বাটীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। উইলির পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, সকলেই তাঁহাকে আদর করিতেন। মিটার পরিবারের আদব-কায়দা এবং কথাবার্ত্তায় প্রমথনাথ নিরতিশয় মুগ্ধ হইলেন।

প্রমথনাথের পিতা ধনী হইলেও পল্লীগ্রামবাসী; শিক্ষিত হইলেও দেশীয় প্রথাপদ্ধতির বশবর্ত্তী। এই জন্য মিটার পরিবারের দৃশ্য, প্রমথনাথের নিকট নূতন এবং কৌতূহলপ্রদ হইল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত গৃহে, উইলির অনূঢ়া কিশোরী ভগিনী 'এমি'র স্বচ্ছন্দ বিচরণ, সুমিষ্ট সম্ভাষণ, এবং পিয়ানোপ্রবৃদ্ধ সঙ্গীত, প্রমথনাথের মানসনয়নে নবীন সৌন্দর্য্য রচনা করিতে লাগিল। এই ইংরাজী মুলুকে, ইংরাজী শিক্ষায় এবং ইংরাজী নবেল প্রভৃতি পাঠে, বাল্যকালে সকলেরই মনে ইংরাজী আদর্শের প্রতি আসক্তি জন্মে, সকল হৃদয়েই ন্যূনাধিক পরিমাণে বিলাতি পদ্ধতি অবলম্বনের কামনা ফল্গুনদীর মত অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিত হয়। অন্তঃসলিলা স্ফুটবাহিনী হইল। প্রমথনাথ ভাবিতে লাগিলেন, যে, দেশীয় সমাজ কি বর্ব্বর, দেশীয় পরিচ্ছদ কি সৌন্দর্য্যশূন্য; এবং দেশীয় অন্তঃপুর কি সুখহীন!

এখন ইংরাজ রাজা; চাকুরী এবং মানসম্ভ্রম ইংরাজের হাতে; তাহাতে বহুদিনের পরাধীনতায় দেশীয় সমাজ বিচ্ছিন্ন; সে অবস্থায় সমাজকে উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করা অতি সহজ। 'সৎসাহস' কিম্বা বীরত্বের প্রয়োজন হয় না। অল্প মাত্রায় বিদ্রুপ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকিলে, এবং লজ্জা পরিহার করিতে পারিলে, এ কার্য্য অতি সুসাধ্য। কিন্তু একটি কথা লইয়া প্রমথনাথ গোলে পড়িয়াছেন; তিনি বিবাহিত। পূর্ব্বে কখনও মনে হয় নাই; কিন্তু এখন মনে হইতে লাগিল যে বিবাহিত হইয়া তিনি কি অসুখী হইয়াছেন।

একদিন সন্ধ্যার পর গৃহের বারান্দায় বসিয়া এমি এবং প্রমথনাথ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; এমির ছোট ছোট ভাইবোনেরা পার্শ্বে বসিয়া

খেলা করিতেছে। শাস্ত্রে নানাবিষয়ের বিধি এবং নিষেধ ব্যবস্থা দেখিতে পাই; কিন্তু চন্দ্রালোকে রমণীমুখদর্শন, নিষিদ্ধ বলিয়া শুনি নাই। নবমীতে অলাবুভক্ষণ করিলে কি পাতক হয়, জানি না; কিন্তু এই চন্দ্রালোকে এমির মুখ দেখিয়া প্রমথনাথের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, কবে বুঝি তাঁহাকে ইংরাজ-কবির বচন আওড়াইয়া বলিতে হইবে O my Amy, mine no more! প্রমথনাথের জীবনকাব্যে এই তাঁহার অনুতাপের প্রথম পরিচ্ছেদ।

(২)

কলিকাতা থাকিলে পড়া ভাল হইবে, এই কথা জানাইয়া, প্রমথনাথ গ্রীষ্মের বন্ধে বাটীতে যান নাই। কিন্তু ছুটীটা মিষ্টার মিটারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে জু দেখিয়া, কোম্পানীর বাগানে গিয়া, ইংরাজী থিয়েটার দেখিয়া কাটাইয়াছেন। এখন পূজার ছুটী উপস্থিত। বাড়ীতে না গেলে আর চলে না। একে বাড়ীতে পূজা, তাহার উপর বাপ মা জিদ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। প্রমথনাথ পিতৃমাতৃবৎসল; বিশেষতঃ এসংসারের কোন আকর্ষণ মাতৃস্নেহকে বিস্মৃত করাইতে পারে না। বাড়ী যাইবেন স্থির করিলেন; ধুতি চাদর পরিতে হইবে, তাহাও না হয় করিবেন; অসভ্য সমাজের লোকজনের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে হইবে, তাহাও কায়ক্লেশে সহ্য করা যায়, কিন্তু এমিকে লইয়াই যত গোলযোগ। এমি জিজ্ঞাসা করিল "কতদিনে ফিরিয়া আসিবে?" কতদিনে! তাইত! গৃহের সম্মুখস্থ পুষ্পকানন, শরতের প্রভাতসৌন্দর্য্যস্নাত; হৃদয়, প্রেমরাগদীপ্ত; এবং এমির রক্তাধর, সদ্য চা-পানসিক্ত। কি বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া

চ

এমির অধর চুম্বন করিলেন। হরি হরি! প্রমথনাথ ভাবিলেন কাজটা বুঝি ভাল হইল না। কিন্তু এমি প্রেমচুম্বিত অধরে, তৃপ্তিজ্ঞাপন করিয়া প্রমথনাথকে আশ্বস্ত এবং উৎসাহিত করিলেন। ঠিক সেই সময়ে শ্রীপুরে একটি মুগ্ধা বালিকা প্রমথনাথের ভগিনী শারদাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "কলিকাতা হইতে পত্র আসিয়াছে কি?" এবং সেই সাপরাধ প্রশ্নটি প্রকাশ না পায় বলিয়া তাহাকে মাথার দিব্য দিতেছিল। বালিকার নাম সরমা।

যাহা হউক, প্রমথনাথ গৃহে গেলেন। বিলাত ফিরিয়া আসিলে এই অধম দেশটা কিরূপ দেখায়, জানি না। কিন্তু এবার প্রমথনাথের চক্ষে শ্রীপুর অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছিল। লোকজন কথা কহিতে জানে না, অর্থাৎ বেশি কথা বলে। সামাজিকতা জানে না, অর্থাৎ বড় মেশামিশি করিতে চাহে। স্ত্রীজাতির প্রতি মর্য্যাদা নাই, কেন না ভদ্রঘরের রমণীরাও দাসীদিগের মত ঘরকন্না করে, কলসী কাঁকালে করিয়া জল টানে। মানসিক পরিবর্ত্তনের ফলে, চিরঅভ্যস্ত দৃশ্যগুলি এইরূপ অদ্ভুত হইয়া উঠিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, প্রমথনাথ যেখানে গিয়া নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবেন, তাহা জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া বালিকা সরমা অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত ঠিক সেই স্থানে গিয়া বসিয়াছিল; এবং প্রমথনাথ উপস্থিত হইবা মাত্র, ঘোমটা টানিয়া ছুটিয়া পলাইল। সম্পর্কের হিসাবে যাঁহারা তামাসা করিতে পারেন, তাঁহারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সরমাকে দেখাইয়া একটু বাক্‌চাতুরী করিবার প্রয়াস পাইলেন। প্রমথনাথ ভাবিলেন, একি বর্ব্বর সমাজ! কোথায় পিয়ানোসঙ্গীত এবং প্রেমসম্ভাষণ,

এবং কোথায় এই ঘোমটা টানিয়া পলায়ন! প্রমথবাবু যখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন তখনই "দৈবাৎ" সরমার চক্ষু দুটি চক্ষে পড়িত; এবং সেই বালিকা ছুটিয়া পলাইত। কিন্তু সেই চক্ষু দুটি! সে কথায় এখন কাজ নাই। পূজার গোলমালে প্রমথনাথের অনুতাপের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হইল।

(৩)

যমের দরজায় কাঁটা দিয়া প্রথমনাথের ভগিনী ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিলেন; ভ্রাতৃদ্বিতীয়া শেষ হইল; পূজার ছুটী কাটিয়া গেল। মা বলিলেন, ছুটী হইলেই বাড়ী আসিও, কলিকাতায় থাকিও না। আত্মীয় পরিজন সকলেই সেইরূপ অনুরোধ করিল। সকলেই অনুরোধ করিল, কিন্তু একজন এবিষয়ে কোন কথা কহে নাই। প্রমথনাথ যখন শয্যায় সুপ্ত হইতেন, তখন যে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নির্ণিমিষ নয়নে মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এবং তিনি জাগ্রত হইলেই নিদ্রার ভাণ করিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইত, সে ত কোন প্রকার অনুরোধ করিল না! সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া কথা কহিতেছে, সেই সময়ে দোতালার ছাত হইতে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া দুইটি চক্ষু তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রমথনাথ সেই চক্ষু একবার দেখিলেন, দুইবার দেখিলেন, বোধ হয় অনেকবার দেখিলেন। যমুনা জলের মত নীল, গঙ্গাজলের মত পবিত্র, আকাশের মত প্রশান্ত, বাতাসের মত স্নিগ্ধ। অনেকবার দেখিলেন; কিন্তু দেখিয়াও দেখিলেন না।

প্রমথনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন যে মিটার পরিবারে একটা গোলযোগ উপস্থিত। কথাটা এই, যে মিটার সাহেবের বৃদ্ধা মাতা

একাকিনী বাড়ীতে থাকিতে পারেন না বলিয়া দেশ হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন। তাঁহার থাকিবার স্থানের অভাব। যে কয়েকটি ঘর আছে তাহার মধ্যে একটি মিটার সাহেবের বেড্‌রুম, একটি ড্রেসিংরুম, একটিতে ছোট ছেলেদিগকে লইয়া আয়া শয়ন করে ; এমিকে কষ্ট করিয়া বেড্‌রুমেই কাপড় চোপড় পরিতে হয়। লাইব্রেরিতে সকলে বসিয়া লেখাপড়া করে ; ডিনার রুম এবং ড্রইং রুমেত লোক থাকা হ'তেই পারে না। সাহেবের ইচ্ছা ছিল, যে কোন একটা ভাল ঘর খালি করিয়া দেন ; কিন্তু গৃহিণীর আদব-কায়দার বিচারে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অবশেষে বাথ্‌রুমের সংলগ্ন একটা ক্ষুদ্র ঘরে বৃদ্ধা স্থান পাইলেন। এমি তাঁহাকে কড়া হুকুম দিয়া রাখিলেন যে, কোন ভদ্রলোক বা মহিলা বাটীতে আসিলে, তিনি যেন লুকাইয়া থাকেন। অসভ্য পরিচ্ছদ মিটার পরিবারে নিষিদ্ধ। প্রমথনাথ উজ্জ্বল সভ্যতার পশ্চাতে গভীর অন্ধকারের ছায়া দেখিলেন। যাহা হউক, কথাটা তাঁহার অধিকক্ষণ মনে রহিল না, কারণ পিয়ানো-স্বর-সংযোগে এমি গাহিতে লাগিল---

আমি প্রাণ দিতে চাহি তারে, প্রাণ নিতে চাহিনা।
আপনা মনে গাহি, চিত্ত ভুলাতে কারো গাহিনা।
লুকায়ে রাখি পরাণে সখি
প্রাণের যত বাসনা,
লুকায়ে রাখি, পরাণে ঢাকি
প্রাণের যত যাতনা।

সুখের নেশা ঘনীভূত হইয়া আসিল। কি করিলে এমি আমার হয়, এই চিন্তায় প্রমথনাথের চিত্ত ব্যথিত হইতে লাগিল।

(৪)

চারিদিকে রাষ্ট্র হইল যে প্রমথবাবু মিটার সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করিবেন। মিটার বিলাত-ফেরত হইলেও হিন্দু। বিবাহ হিন্দুমতে হইবে, কাজেই বহুবিবাহের দোষ স্পর্শিবে না। জনরব শ্রীপুর পর্য্যন্ত পঁহুছিল।

প্রমথনাথের পিতা, তাঁহাকে বাড়ী যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন; অবশেষে লোকও পাঠাইলেন। প্রমথনাথ এম এ, পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু অগত্যা, শ্রীপুর যাইতে হইল। বয়স্যেরা আকার ইঙ্গিতে কথাটা পাড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তিনি কোন কথাই কানে তুলিলেন না। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! লোকে কত কিছু বলিতেছে, সেকি সত্য?" প্রমথ নিরুত্তর। কিন্তু মনে মনে কৃত-সঙ্কল্প, যেমন করিয়া হউক এমিকে বিবাহ করিবেন। পিতা, রাশভারি লোক, কখনও পুত্রের সঙ্গে বেশী কথা কহিতেন না; এবিষয়েও কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন না। পুত্রকে গৃহে আনিয়াছেন, গৃহেই রাখিলেন। পাড়ার মেয়েরা জুটিয়া সরমাকে শিক্ষা দিল, যে, সে একবার স্বামীকে উপরোধ অনুরোধ করিবে, এবং স্ত্রীজাতির ব্রহ্মাস্ত্র—একটু চক্ষের জল ফেলিবে। সরমা বিরক্ত হইয়া বলিল "ছি।" সকলে তাহাকে হাবা মেয়ে বলিয়া তিরস্কার করিল; কিন্তু সে কাহারও কথা শুনিল না।

প্রমথনাথ যেদিন বাটীতে আসিলেন, সেইদিন রাত্রে শয়নকক্ষে গিয়া দেখিলেন, শয্যার একপার্শ্বে সরমা শয়ানা। এমি বলিয়াছিলেন যে সরমার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না। সেই কথা মনে পড়িল। প্রমথ বাবুর "মরাল ফিলসফি" পড়া ছিল; তিনি গম্ভীরভাবে সরমাকে

বলিলেন, "তোমার সঙ্গে একত্র শয়ন নীতিবিরুদ্ধ : তুমি অন্যত্র যাও"। ভালবাসার কথা বলিলে সরমা হয় ত কথা বলিত না ; কিন্তু এবার উঠিয়া বসিল। স্থিরভাবে কহিল, আমি এখন অন্যঘরে গেলে, বড় গোল হইবে। মা আমাকে বকিবেন ; ঠাকুর তোমাকে তিরস্কার করিবেন। আমি এক কোণে পড়িয়া থাকি, ক্ষতি কি ? প্রমথনাথ ঠিক ঝগড়া বাধাইবেন বলিয়া ছুতা খুঁজিতে আসেন নাই : কিন্তু একটু কিছু হইলে ভাল হইত। তাহা হইলে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হওয়ার পক্ষে বেশ সুবিধা হইত। অলক্ষ্যে এই ভাবটি মনের মধ্যে নিহিত ছিল। প্রমথনাথ সরমাকে বলিলেন, "আমি বিবাহ করিব—তোমার সঙ্গে আমার প্রকৃত বিবাহ হইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি না। তুমিও জান যে তুমি আমাকে ভালবাস না।" বালিকা সরমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল ; কিন্তু সে অকম্পিত স্বরে কহিল, "তুমি যাহাতে খুসী হও নিশ্চয়ই তাহা করিবে, কিন্তু মাকে এবং ঠাকুরকে রাজি করিয়া কাজ করিও। মাকে ভাল করিয়া বলিলে তিনি সম্মতি দিবেন।" অবস্থায় পড়িলে মুগ্ধাও প্রগল্‌ভা হয়। দীপালোক অনুজ্জ্বল ; মানস নয়ন-পথে এমির প্রেম-কুহেলিকার আবরণ : প্রমথনাথের চক্ষে, সরমার যজ্ঞ-বহ্নির মত প্রদীপ্ত রূপ, প্রতিভাত হইল না। সরমা শয্যার একপার্শ্বে মুখ লুকাইয়া শুইল ; প্রমথনাথ আর কোন কথা না কহিয়া নিশি যাপন করিলেন। তাহার পর-দিন হইতে সরমা, শয্যাগৃহে অন্য শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিতে লাগিল।

(৫)

"আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক, ঐ এক ছেলে। বিবাহে বাধা দিলে কি হইবে কে জানে ; প্রমথ বিবাহ করুক। কত লোকে দুই বিবাহ

করে; তুমি আপত্তি করিও না।" কথাগুলি প্রমথনাথের মাতা বিজনে আপন স্বামীকে বলিলেন। প্রমথনাথের পিতা "হুঁ হুঁ" করিলেন; কিন্তু কোন কথার উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "আমার মা লক্ষ্মীর কি হইবে?" সরমাকে প্রমথনাথের পিতা মা লক্ষ্মী বলিতেন। গৃহিণীও সরমাকে পুত্রী নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন; বলিলেন, "যাহার কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে।" কিন্তু কথাগুলি বলিতে বলিতে চক্ষুদিয়া জল পড়িল।

যাহাই হউক, আবার রাষ্ট্র হইল যে এমির সহিত প্রমথনাথের বিবাহ হইবে এবং সে বিবাহে তাঁহার পিতা, মাতা, স্ত্রী, প্রভৃতি সকলেই সম্মত। প্রমথবাবু আবার কলিকাতায় গেলেন।

তিনি যখন কলিকাতায় পৌঁছিলেন, তখন বেলা ১১॥০টা। বাসায় না যাইয়া একেবারে মিটার-ভবনে উপস্থিত হইলেন। মিটার-সাহেব তখন স্বীয় কার্য্যে আপীসে গিয়াছেন; উইলি গৃহে নাই, সে এম এ, পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়াছে; ছোট ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে গিয়াছে; গৃহিণী এবং এমিও মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রাম করিতেছেন। বাড়ীতে কাহারও সাড়া শব্দ নাই। মিটার গৃহের দ্বার তাঁহার নিকট অবারিত, তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। খানসামা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল; তিনি তাহাকে গৃহের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। খানসামার মুখে শুনিলেন, সাহেবের বৃদ্ধা-জননী অত্যন্ত পীড়িতা। অমনি প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। অতি ঘৃণিত শয্যায়, অনাদরে, স্নান করিবার পার্শ্বস্থিত একটি ক্ষুদ্র ঘরে তিনি শয়ানা। প্রমথবাবু তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা মুখ তুলিয়া চাহিল।

প্রমথ বাবুর দয়া দেখিয়া চক্ষু দিয়া জল পড়িল, এবং বৃদ্ধবয়সসুলভ বাক্-বাহুল্যতা প্রকাশ পাইল। যাহা শুনিলেন, তাহাতে বড়ই ক্লিষ্ট হইলেন। মিটার সাহেব মাতার সেবা করিতে অনিচ্ছুক নহেন, কিন্তু মিসেস্ এবং এমি প্রতিবাদিনী। গৃহিণীর অনভিমতে কোন কার্য্য করা সাহেবের সাধ্যাতীত। এমির নামে দুর্নামটা প্রমথবাবু বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু ভাবিলেন যে বৃদ্ধার সেবার একটা বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রমথবাবুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া মিসেস্ এবং মিস্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার অভ্যর্থনার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রমথবাব বৃদ্ধার কথা পাড়িলেন, এবং অল্প কথা-বার্ত্তার পরেই ভাবগতিক বুঝিয়া প্রস্তাব করিলেন, যে স্থান পরিবর্ত্তন করিলে উপকার হইতে পারে; এবং তিনি তাঁহার নিজের বাসায় লইয়া যাইতে প্রস্তুত। তাঁহার একাগ্রতা দেখিয়া কথাটার কেহ প্রতিবাদ করিল না—এবং প্রমথবাবু পাল্কী ডাকাইয়া বৃদ্ধাকে আপনার বাসায় লইয়া গেলেন। উজ্জ্বল সভ্যতার অন্তরালস্থিত অন্ধকার এবার ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হইল।

ডাক্তার ডাকিলেন, রাত্রিদিন নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষা করিলেন:— কিছু-তেই কিছু হইল না। মিটার সাহেবও অবকাশ পাইয়া নিয়ত আসিয়া মাতার সেবায় নিযুক্ত হইতেন। বৃদ্ধা পুত্রমুখ চুম্বন করিয়া, প্রমথনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর, সাহেব, প্রমথবাবুকে তাঁহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। প্রমথবাবু অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, তিনি আর তাঁহার গৃহে যাইবেন না। মিটার সাহেব কথাটার অর্থ বুঝিলেন—এবং বিনা বাক্যব্যয়ে স্বগৃহে প্রতি-

নিবৃত্ত হইলেন। প্রমথ বাবু তিনচারিটি হ্যাট্ কিনিয়াছিলেন, সেগুলি অগ্নিদেবকে উপহার দিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। অনুতাপের এই আর এক পরিচ্ছেদ।

(৬)

প্রমথবাবু এমিকে বিবাহ করিবেন না, স্পষ্ট জানাইলেন। তখন একদিন এমির পক্ষ হইতে একখানি উকিলের চিঠি পাইলেন; তাহাতে লেখা ছিল, যে বিবাহ-চুক্তি ভঙ্গের জন্য তাঁহাকে ৩০ হাজার টাকা ড্যামেজ দিতে হইবে। চিঠিখানি একখানা খামে পূরিয়া, মিটার সাহেবকে পাঠাইয়া দিয়া, প্রমথবাবু শ্রীপুরে চলিয়া গেলেন। গৃহে যাইতেছেন, এসংবাদ গৃহের লোকের জানা ছিল না। রাত্রে ষ্টেসনে পৌঁছিয়া একাকী পদব্রজে গৃহে গেলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গেলেন, কাজেই গৃহে পঁহুছিতে অনেক রাত্রি হইল। পথে দুই একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাহারা বলিল, "এ কি বাবু, আপনি একাকী?" প্রমথবাবু কথা কহিলেন না। তাহারা সঙ্গে যাইতে চাহিল, পাল্কীর বন্দোবস্ত করিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু প্রমথবাবু তাহাদিগকে বিদায় দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার গম্ভীর্য্য দেখিয়া, কেহ আর কথা কহিতে সাহসী হইল না।

অলক্ষ্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চাকরেরা প্রায় সকলেই জাগ্রত ছিল; কিন্তু তাহারা বহির্ব্বাটিতে বসিয়া দারোয়ানজির মুখে তদীয় বীরত্বের কথা শুনিতেছিল, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

আপনার শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত করিলেন, এবং মৃদুকণ্ঠে কক্ষাভ্যন্তর হইতে প্রশ্ন হইল "কে?"। প্রমথবাবু স্বর শুনিয়াই

বলিলেন, "শারদা", দরজা খোল; আমি।" শারদা একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল "ওমা দাদা! কখন এলে?"—প্রমথবাবু কহিলেন, "চুপ! দরজা খুলিয়া দে।" শারদা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিল; এবং দাদার পায়ের ধুলা মাথায় দিল। প্রমথবাবু দেখিলেন, শারদার সঙ্গিনী শয্যায় নিদ্রিতা। তখন শারদাকে বলিলেন, "তুই কাহাকেও না জাগাইয়া অন্য ঘরে গিয়া শুইতে পারিবি?" শারদা কিছুই বুঝিতে পারিল না; ভাবিল "এ কি"। জিজ্ঞাসা করিল, "কি-হয়েছে দাদা?" প্রমথনাথ সস্নেহে বলিলেন, "কিছু নয়, আমার শরীর তত ভাল নাই, একটু শুইব। তোর পায়ে পড়ি কাহাকেও কিছু বলিস্‌নে— এখন অন্য ঘরে গিয়ে শো।" শারদা এ অদ্ভুত প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হয় না; তখন তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া প্রমথবাবু গোপনে কি যেন কহিলেন; সে সস্মিত মুখে অন্যঘরে যাইবার ভাণ করিয়া কিছু দূরে গিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া আসিল, এবং বৌ-দিদির ঘরের জানালার ধারে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটা বড় দুষ্ট; এবং সমাজটা বড় বর্বর।

সরমা তখনও নিদ্রিতা। প্রমথবাবু ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন তাহার শয্যার পার্শ্বে দেওয়ালে, তাঁহার একখানি ফ্রেমে বাঁধা ফটো। বুক মেঘে ভরা ছিল, চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারা বহিল। অশ্রুসিক্ত মুখ, নিদ্রিতা সুন্দরীর চরণপদ্মে স্থাপন করিলেন। সরমা চমকিতা হইয়া জাগিয়া উঠিল; দেখিল, পদতলে তাহার ইষ্ট-দেবতা। পা ছাড়াইয়া লইয়া আলুথালু বেশে শয্যা হইতে উঠিয়া পায়ের ধূলা মাথায় দিল। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অসভ্য দেশ বটে।

প্রমথ বলিলেন, "সরমা, আমাকে ক্ষমা কর?" সরমা ভাবিল, স্বামী বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন;—তাই এই ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছেন।

হাসিয়া বলিল, "একা আসিয়াছ? না নূতন বৌ নিয়ে? আমি দেবী-চৌধুরাণী পড়িয়াছি—সতীনের সঙ্গে ভাব করিব।" প্রমথ বলিলেন, তিনি সে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সরমা, প্রতিমা বিসর্জ্জন কথাটার অর্থ বুঝিল না; ভাবিল এমি বুঝি মরিয়াছে। অমনি কাঁদিয়া ফেলিল, শপথ করিয়া বলিল, যে তাঁহাকে এবং এমিকে সুখী করিবার জন্য সে কত কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিল। প্রমথনাথকে বেষ্টন করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমি তোমাকে সুখী করিতে পারি নাই, যে তোমাকে সুখী করিতে পারিত সে মরিল! আমার কপাল মন্দ!" হায় প্রমথনাথ! বিলাতী ছাঁচে কি এমনটি গড়ে! প্রমথবাবু অল্প কথায় বিবাহভঙ্গের ইতিহাস বলিলেন; এবং লুকাইয়া আসিয়া, প্রথমেই তাহার কাছে আসিয়াছেন, বলিলেন। সরমা চমকিয়া উঠিল। "ছিছি সেকি কথা! তুমি এখনি যাও, আগে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর।" অগত্যা প্রমথনাথ বাহির হইলেন। শারদার কর্ণে সবকটি কথাই গিয়াছিল; সে আগেই ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া তুলিল। এবং ছুটিয়া গিয়া একটি দাসীর পিঠে কীলের উপর কীল বসাইতে লাগিল। এটি শারদাসুন্দরীর আদরের দাসী। দাসী বলিল, "কর কি দিদি মণি! কর কি, লাগেযে!" শারদার যেন আহ্লাদের সীমা পরিসীমা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া দাসী বেচারী মার খাইয়া মরে কেন?

কলঙ্ক।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পত্র।

ভাই বিমলাচরণ,

আমাদের ছাত্রজীবন শেষ হইল; তুমিও চাকুরী লইয়া বিদেশবাসী হইলে। আমি এখন কি করিয়া সময় কাটাইব ভাবিতেছি। সংসার কর্ম্মময়; এবং মনুষ্যজীবনও কর্ম্মসেবায় নিয়োজিত হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পীড়িতের আর্ত্তনাদ, পীড়কের জয়োল্লাস, দরিদ্রের দৈন্য, ধনীর ঔদাসীন্য, দুঃখীর মর্ম্মবেদনা এবং সুখীর ভোগবাসনা, আমাদিগকে নিয়ত কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে। মূর্খের অপমান, জ্ঞানীর অভিমান, পুণ্যের মলিনতা, পাপের অসীমতা, পরার্থপরতার অভাব এবং আত্মাদরের

প্রভাব আমাগদিকে কর্ম্মপরায়ণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। কিন্তু কি করিব? এই অনন্ততরঙ্গসংক্ষুব্ধ সংসারসাগরে আমার ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যের ভেলা ভাসাইতে পারিব কি? আমার পিতৃদেবের ইচ্ছা, আমি আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই। এ ব্যবসায়ের উপযোগী অনেক আয়োজনও করিয়াছিলাম, জান। কিন্তু রামের সম্পত্তি শ্যামকে দিয়া, অথবা জমীদারের চক্রান্তজড়িত নিরীহ প্রজাকে জেলে পাঠাইয়া, আমার কি সুখ হইবে? মনীষীনাথেরও ইচ্ছা নয় যে আমি ব্যবহারজীবী হই। তিনি আমারও গুরু আমার পিতারও গুরু. তিনি জ্ঞানী, তিনি ধার্ম্মিক, তিনি ঋষিতুল্য। তাঁহার ইচ্ছা যে আমি বুদ্ধদেবপ্রমুখ মহাপুরুষদের পদানুসরণ করিয়া কর্ম্মযজ্ঞ আরম্ভ করি। কিন্তু এ যজ্ঞের জন্য, সমিৎপুষ্পাদি আহরণ করিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নাই। যে দেবপ্রসাদ ইহার প্ররোচনা, তাহা কি কখনও লাভ করিতে পারিব? ক্ষমা করিও, একটা ইংরাজী কথা তুলিবার প্রবৃত্তি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। Many are called, but few are chosen.

আমি কি করিব তাহা স্থির হয় নাই। কাজেই অতিশয় সুখময় কিছু-না-করা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইহারই নাম বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। কথায় বলে যে, কোন কাজ না থাকিলে, খুড়ার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করে। আমার বেলায় কিন্তু উল্টা হইল। কোন কাজকর্ম্ম নাই দেখিয়া, দশজনে মিলিয়া আমার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিতেছে। চারিদিক হইতে আমার বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে। ধেড়ে বয়সে আর বাল্যবিবাহের নিষিদ্ধতার আপত্তি তুলিবার পথ নাই। পিতারও একান্ত ইচ্ছা, আমি বিবাহ করি। এ ইচ্ছা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; কারণ তাঁহার পারি-

বারিক জীবনের সুখহীনতা; আমার বিবাহে দূরীকৃত হইবে বলিয়া, তিনি আশা করেন। কিন্তু আমি যদি বিবাহ করিয়া সুখী না হই, তাহা হইলে তাঁহার আশা ত ফলবতী হইবে না। এখন আমি দশজনের অনুমোদনে বিবাহ করিলে, আমার জীবনের চিরপোষিত আদর্শ চূর্ণ হইয়া যাইবে। গুরু মনীষীনাথও পিতার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। যাহা হউক, আমি যথাসাধ্য এ প্রস্তাব রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

শীঘ্রই একবার নগাধিরাজ হিমালয়দর্শনে যাইব। আমাদের আত্মীয় রাসবিহারী বাবু এখন দার্জিলিংএ। তাঁহার কন্যা মৃণ্ময়ী, সেখানকার লতাপাতা ফুল উপহার পাঠাইয়াছেন। তুমি যে অঞ্চলে গিয়াছ, সেখানে খুব পাহাড় আছে লিখিয়াছ। বঙ্গদেশেই কেবল ধান্যক্ষেত্রপূর্ণ সমতল ভূমি। শীঘ্র পত্র লিখিও।

তোমার স্নেহের
বিভূতিনাথ।

দ্বিতীয় পত্র।

স্নেহের বিভূতিনাথ,

তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বে পত্র লিখিয়াছিলাম। সেখানি নানা কথার বর্ণনায় আটপৃষ্ঠা কলেবর লইয়া গিয়াছে। বিদেশে, নিঃসঙ্গ গৃহে তোমার পত্রই আমার একমাত্র বন্ধু।

ফলাহারের নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণের অরুচি, এবং বিবাহে যুবকদের বৈরাগ্য, নূতন কথা বটে। তবে লুচি পাটান ব্যবস্থা থাকিলে চিঁড়ে দই উপেক্ষা

করা যায়। পাহাড়ের লম্বা পাত্তার অনুরাগে শৈলভ্রমণে সাধ হইয়াছে, ভাল কথা। কালিদাসের সময়ের 'একোহি দোষঃ' এখন গুণবিশেষে পরিণত; সেই দেবতাত্মা মনুষ্যের আবাসে পরিপূর্ণ। যদি দার্জ্জিলিংএ যাও, তাহা হইলে দেবতাত্মার মন্দিরে সচলাদেবী দেখিতে পাও কি না, লিখিও।

কলিকাতার পাত্রীতে যদি মন না উঠে, তবে এখানকার একটা পাহাড়ে মেয়ে পাঠাইয়া দিব। রং খুব কাল; কিন্তু যৌবনসন্নদ্ধা, অসিতাঙ্গিনী, মনমোহিনী নহে বলিতে পারিবে না। চক্ষু বড় উজ্জ্বল; বিনা আগুনে চুরুট ধরান চলিতে পারে। ভাল কথা; আমার জন্য কিছু চুরুট পাঠাইয়া দিও। কেন না, বুদ্ধির গোড়ায় ভাল করিয়া ধোঁয়া না দিলে, তোমার মনের ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিব না।

স্নেহাধীন

বিমলাচরণ।

তৃতীয় পত্র।

প্রিয় বিমলাচরণ,

পিতার অসুস্থতার জন্য আমরা ভারি ব্যস্ত। এমন প্রবল জ্বর, কদাচিৎ দেখা যায়। প্রলাপ বকিতেছেন, এবং মুহুর্মুহু আমার স্বর্গবাসিনী জননীর কথা, ও আমার বিবাহের কথা বলিতেছেন। স্বতই মনে হইতেছে, যেন আমি বিবাহ করিব না বলিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। পিতার বন্ধু বান্ধবেরা নিরন্তর আমাকে বলিতেছেন যে আমি প্রাচীন প্রথা অনুসারে বিবাহ করিব না, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় হইয়াছে বলিয়া মর্ম্মাহত

হইয়াছেন। মনে হইতেছে যে, তোমাকে দার্জিলিং হইতে যে সকল কথা লিখিয়াছিলাম, কেহ কেহ তাহার আভাষ পাইয়াছেন বলিয়া, পিতৃদেবের শান্তির কামনায় এত ব্যস্ততা দেখাইতেছেন। এটা আমার অনুমান মাত্র।

যে আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া আমরা জীবনপথে অগ্রসর হইতেছিলাম, তাহা কি চিরদিনের মত পরিহার করিব? পিতার অসুস্থতা দেখিয়া অনেকবার ভাবিতেছি যে, আত্মসুখকামনায় জলাঞ্জলি দিয়া, যিনি জীবন-দাতা, তাঁহার শান্তি এবং সুখবিধানের জন্য, যাহা করিতে হয় করিব। যত কষ্ট সহিতে হয় সহিব; কিন্তু অকরুণ সংসারের হাটে পিতৃহন্তা নাম ক্রয় করিব না। আবার ভাবিতেছি যে, আমি যদি বিবাহ করিয়া অসুখী হই, তাহা হইলে ত পিতার অসুখের সীমা থাকিবে না। এখন কি উপায় করি?

আমরা ঘটনা এবং অবস্থার দাস; আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? কতবার ভাবিয়াছিলাম যে, মনুষ্য জীবন করুণাময়ের কৃপাভূমিতে দৃঢ়-প্রোথিত স্তম্ভ। কিন্তু এখন মনে হইতেছে, যেন এ জীবন নিয়তির স্রোতমুখে তৃণমাত্র। পিতার শয্যাপার্শ্বে যাইতেছি; এখন বিদায় হই।

নয়তিতাড়িত

বিভূতিনাথ।

চতুর্থ পত্র।

(সারদা বাবুর পত্র)

প্রিয় বিমলাচরণ,—

আমি তোমার শিক্ষক, তুমি আমার ছাত্র। তোমাকে জোর করিয়া একটা কাজ করিতে বলিলে করিবে না কি? বিভূতিনাথের পিতার

অসুস্থতার কথা হয় ত শুনিয়াছ। তাঁহার মত আদর্শচরিত্র, ন্যায়পরায়ণ এবং পরোপকারী ব্যক্তি সমাজে দুর্লভ। তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য বিভূতিনাথ যদি জীবন বিসর্জ্জন করেন, তাহাও প্রার্থনীয়। বিভূতির মাতৃস্নেহহীন শৈশব এবং যৌবন, যাঁহার স্নেহে পালিত এবং বর্দ্ধিত, তাঁহার জীবন রক্ষার উপায় এখন বিভূতিনাথের হস্তে। রোগশয্যায় পড়িয়া বিভূতিনাথের মাতার কথা, এবং বিভূতিনাথের বিবাহের কথা যে ভাবে বলিতেন, তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই তোমার মন গলিয়া যাইত। পুত্রবধূ লাভ করিলে, তিনি হতভাগিনী সহধর্ম্মিণীর বিয়োগ-দুঃখ বিস্মৃত হইতে পারিতেন। আত্মসুখ উপেক্ষা করাই যখন শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, তখন বিভূতিনাথ প্রাচীন প্রথায় বিবাহ করিয়া পিতাকে সুখী করুন। আমরা এ বিষয়ে কথা কহিলে তিনি উত্তর দেন না। এ সময়ে তুমি একবার উহাকে অনুরোধ কর। বিবাহ পদ্ধতিটা যাহাতে মনের মত হয়, অথচ সমাজ-দ্রোহিতা না হয়, তাহার ভার লইতে আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি। নিশ্চয়ই অনুরোধ করিও; আমাদের অনুরোধেই না হয় অনুরোধ করিও—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীসারদাপ্রসাদ—

পঞ্চম পত্র।

প্রিয় বিভূতিনাথ—

তোমাকে, তোমার পিতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে, অর্থাৎ একবার হাতে সূতা বাঁধিতে অনুরোধ করার জন্য, অনুরুদ্ধ হইয়াছি। তোমার

মনের কথা জানি, কষ্টের কারণ কি তাহাও বুঝিতেছি ; এমন অবস্থায় একটা ঢেঁকি গিলিতে অনুরোধ করা সহজ নয়।

তুমি মানসপটে যাঁহার ছবি আঁকিয়াছ,--তিনি তোমার প্রণয়প্রার্থিনী কি না, জান না। তাঁহার সদ্ব্যবহার, সৌজন্য এবং আনুগত্য, ভিন্ন শ্রেণীর স্নেহের ফলেও হইতে পারে। তুমিও ত লিখিয়াছিলে যে, নানা কারণে একটা সত্য সত্য প্রস্তাব করিবার দিকে তুমি অগ্রসর নহ। এরূপ অবস্থায়, যদি তাঁহার ছবিটি একটু অপার্থিব রঙে আঁকিয়া রাখ, এবং গৃহ-শান্তির জন্য একটা বিবাহ কর, তাহা হইলে চলিতে পারে কি না? কথাটা যেন আধখানা প্রাণে লিখিলাম। জমাট বাঁধিল না। যাঁহার আলোকে জগৎ ভাস্বর, তাঁহার আলোকে পথ দেখিয়া চলিও। তোমার পিতার আরোগ্যসংবাদের জন্য উৎসুক রহিলাম। মনীষীনাথকে আমার প্রণাম জানাইও।

হতবুদ্ধি

বিমলাচরণ।

ষষ্ঠ পত্র।

প্রিয় বিমলাচরণ—

অশেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আমার সম্পূর্ণ ধারণা যে, তোমার অনুরোধে অনেক উপকার হইয়াছে। ঈশ্বরকৃপায় বিভূতিনাথের শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার পিতা সুখী, পরিবার পরিজন সুখী, আমরাও সুখী।

বিভূতিনাথের মন এখনও প্রসন্ন নহে ; কিন্তু অল্প দিনেই হইবে। বয়স না হইলে বিবাহ করিব না, এই ইংরাজি প্রথামূলক ভাবটা, তাঁহার অন্তঃকরণে বদ্ধ ছিল। সেইজন্য মনোনয়ন প্রথার অভাবে, এখনও বিবাহটা উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন না। তিনি বলি-তেছেন যে, তাঁহার মনে হইয়াছিল, যে বিবাহে তিনি একজন দর্শকমাত্র। পাত্রীটি খুব সুন্দরী। কিন্তু বিভূতিনাথ তাঁহার মুখ দেখিয়া বলিয়াছেন যে, যদি মুখের ছবিতে মনের প্রতিকৃতি থাকে, তবে তাঁহার পত্নী খুব নির্ব্বিরোধী হইবেন ; এবং তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা না দিয়া, সকল বিষয়েই উদাসীনতা দেখাইবেন। বিবাহকে বিবাহ বলিয়া গ্রাহ্য না করা, অথবা অন্য কোন ভাব মনে পোষণ করা, সামাজিক সন্নীতির বিরোধী। যাহা হউক তাঁহার কথাগুলি বড়ই অদ্ভুত। আশা করি তোমার বন্ধুটি যাহাতে উন্মাদগ্রস্তের মত কোন ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসারদা প্রসাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পত্র।

সোদরপ্রতিম বিমলাচরণ—

সংসারযাত্রায়, বিবাহের পালায়, পাত্র পাত্রী সং। যে দিন সং সাজিয়াছিলাম, সে দিন যদি তুমি দেখিতে! পিতার যেন এখন আনন্দ

আর ধরে না ; আবার যেন বাল্য জীবন ফিরাইয়া পাইয়াছেন। সর্ব্বদাই হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, এবং দশরকমে লোকজনের সঙ্গে মিশিতেছেন। কিন্তু হায়! আমার অন্তঃকরণের অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে।

নানা গোলে তোমার একটা পুরাতন অনুরোধ বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এবার তোমাকে সিগার ও সিগারেট পাঠাইলাম।

একটা ভাল কথা লিখি। শ্রীযুক্ত মনীষীনাথের নিকট বসিয়া বুদ্ধদেবের চরিত পাঠ ও শ্রবণ করিতেছি। ক্ষুদ্রদর্শীরা সংসারকে সুখময় বলে ; কিন্তু বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, সংসার দুঃখময়। হিমালয়ের চিরতুহিনাবৃত শৃঙ্গে সূর্য্যকিরণসম্পাতের মত, মনীষীনাথের উন্নত এবং নির্ম্মল হৃদয়ে, সিদ্ধার্থের অপার্থিব শিক্ষার দীপ্তি বড় মনোহর। মনে মনে আশা হয় যে, একদিন সকল উপধর্ম্ম বিনাশ করিয়া, সেশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীতে জয়লাভ করিবে।

তোমার

বিভূতিনাথ।

দ্বিতীয় পত্র।

প্রিয়ং মে,

তোমার প্রেরিত চুরুটগুলি পাইলাম। তুমি ইহার সেবক না হইলেও সমজদার ব্যক্তি ; বেড়ে চুরুট। মিষ্টান্নটা ইতর জনের জন্য ; কিন্তু চুরুটটা নিশ্চয়ই আপনার লোকের জন্য।

কোন একটা নেশা না করিলে বুদ্ধি খোলে না ; সাক্ষী কমলাকান্ত শর্ম্মা। ধূম্রপান যে সাহিত্যচর্চ্চার অনুকূল, তাহার অনেক বিলাতি

দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আজি চুরুটধূম্রমার্জ্জিত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি যে, তোমার আতঙ্ক এবং হুতাশ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। পাত্রী যখন সুন্দরী এবং সৎকুলোদ্ভবা, তখন পরে সুখী হইতে পারিবে।

বুদ্ধদেব কোন নেশা করিতেন না; কাজেই তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বজনাদ্রিত হইবার আশা নাই। খৃষ্ট বিশুদ্ধ জলকেও লাল পাণিতে পরিণত করিতে পারিতেন। শিষ্যদিগকে রুটির সঙ্গে যাহা পান করিতে দিতেন, তাহা জান। তাঁহার ধর্ম্মের সঙ্গে বুদ্ধদেবের তুলনা! প্রকৃত পক্ষেই আমার মনে হয় যে, খৃষ্টধর্ম্ম, লোক সাধারণের যত উপযোগী, এমন আর দেখিবে না। সাধারণ লোকেরা একটা বিশুদ্ধ মত লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা যাহাকে কুসংস্কার বলেন, তাহা না থাকিলে সাধারণের মনো-রঞ্জন হয় না। নিরবচ্ছিন্ন আলোক আমাদের চক্ষে বড় ক্লেশদায়ক। ভাল কথাও আছে, ভূতও আছে, নররূপী ঈশ্বর আছেন, স্বর্গ নরক আছে, শয়তান আছে, জেতা এবং প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত জাতির পৃষ্ঠপোষকতা আছে; এমন ধর্ম্ম আর হয়? প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম লোক সাধারণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কিন্তু এ ধর্ম্ম বিজিত জাতির ধর্ম্ম, তাহার উপর ভিন্নজাতীয় লোক লইবার প্রথা নাই। কাজেই খৃষ্টধর্ম্মেরই জয়। একটা মহাপুরুষ খাড়া করিতে না পারিলে, ধর্ম্ম গড়া যায় না। সে হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু আশা আছে। দেখিতে পাইতেছি যে, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে যীশুর পরিচ্ছদ পরাইয়া, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকামনায় নূতন আদর্শ গড়িতেছেন। বুদ্ধির কর্ম্ম বটে। কিন্তু গোবিন্দ অধিকারীর দূতীর ভাষায় আক্ষেপ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, "ও সে পীতধড়া কই, ও সে চূড়া কই, ও সে বাঁশী কই?" কেহ ইহাতে বলিতে পারেন যে,

এ প্রকার পরিবর্ত্তনে ক্ষতি কি! ক্ষতি না থাকিতে পারে; বরং একদিন এই প্রকার প্রয়াসে হিন্দু সমাজের উপকার হইয়াছিল। আদর্শ মহা-পুরুষ লইয়া বৌদ্ধদের জয় হইতেছিল বলিয়া, তাহাদের পরাজয়ের জন্য, হিন্দুরা অবতার সৃষ্টি করিয়াছিল। পূর্ব্বকাল হইতে দেশময় যে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রবাদ কথা, প্রাচীন প্রবাদরূপেই চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া, নূতন আদর্শে রামায়ণ ও মহা-ভারত রচিত হইয়া, হিন্দুজাতির আদর্শ মহাপুরুষ গঠিত হইয়াছিল। কাজেই কেহ আমাকে বলিতে পারেন, যে একালে যদি পরিবর্ত্তিত রুচির অনুসারে, মহাভারতের অংশবিশেষ সুবিধামত প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া নূতন কৃষ্ণ গড়া যায়, তাহাতে তোমার বা দূতীঠাকুরাণীর ক্ষোভের কারণ কি? বিলাতী আইনের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, প্রাচীন কথাগুলি "ফিক্‌সনের" কলে ফেলিয়া দিয়া, নূতন পুরাতনে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও সেই "ফিক্‌সন"। ইহাতে হয় এই, খোলও বদ্‌লায়, নলচেও বদ্‌লায়, তবুও সেই প্রচীন হুঁকাটাই বজায় থাকে। আমি নেশাখোর লোক, অন্য দৃষ্টান্ত পাইলাম না। আমি বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থাদি বিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু আমার মনে হয় যে, সেখর বৌদ্ধধর্ম্মটাও উক্ত প্রকারের বদ্‌লান জিনিষ। তুমি কেন বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া আমাদের শিক্ষা দেও না?

তোমার

বিমলাচরণ।

তৃতীয় পত্র।

ভাই বিমলাচরণ,

এখন আর আমি বড় কেও একটা নহি। সুবিখ্যাত হুতুমের মত, আমার বাল্যকালের জেঠামিটুকু, মুরুব্বি-আনায় দাঁড়: করাইয়াছি। একটা সভা ফাঁদিয়া, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনার একশেষ করিতেছি। কথা এই, উপলক্ষ্য না থাকিলে দিন কাটে না। তাই, যাহারা শিক্ষিত এবং মার্জ্জিতরুচি, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিবার মিশিবার সুবিধার জন্য একটি সভা করিয়াছি। তোমাকে আন্দাজে বলিতে হইবে, এ সভার সভ্য কে কে। এই সভার কৃপায়, সময়টা সুখে অতিবাহিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিও; তোমাকে কয়েকখানা বই পাঠাইয়া দিব। বড় হাসি পাইল যে, তুমি আমাকে সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতে, ওরফে গ্রন্থকার হইতে অনুরোধ করিয়াছ। এমন কি পাপ করিয়াছি, যে আমার চিন্তা এবং ভাবগুলির মুক্তপক্ষ স্বাধীনতা নষ্ট হইবে? এবং সেগুলি মুদ্রাযন্ত্রের লোহার ফর্ম্মার চাপে ছিন্নপক্ষ হইয়া, চিরকালের মত ডিমাই বা রয়েল পৃষ্ঠা পরিমিত স্থানে অবরুদ্ধ থাকিবে? গ্রন্থকার জাতির লক্ষণ এই যে, তাঁহারা একবার কোন কথা ছাপাইয়া ফেলিলে পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। বরং আপনাদের অভ্রান্ত কথা-গুলির গৌরব রক্ষার জন্য, কেবল নিরন্তর মিথ্যার উপর মিথ্যা চাপাইয়া চলেন। প্রতি দিন যাহার মতের পরিবর্ত্তন, তাহার পক্ষে লেখক হওয়া সাজে না। সত্য কথা এই, যে আমি এমন সুকৃতি করি নাই, যে অক্ষরময়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিব।

কিছুদিন হইল বড় অবসরের অভাব হইয়াছে বলিয়া, তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইতেছে। আমার পিতার দুই জন বন্ধু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিবারবর্গের দেখিবার কেহ নাই; অথচ অনেক সম্পত্তি আছে। সে সকলের তত্ত্বাবধান করিতে হইতেছে। অনেক বন্ধু আছেন, যাঁহারা এটর্ণিকে টাকা দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষয়িক ব্যবহারের কাগজপত্রগুলির লেখাপড়া করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের একটু সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতে হইতেছে। কলিকাতা সহরে মৌনী শিয়ালের দৌরাত্ম্যে অনেক গরীব ভদ্রলোককে নাস্তানাবুদ হইতে হয়। তাঁহাদের জন্য একটু পরিশ্রম করিতে পারিলে, পরিশ্রমের স্বার্থকতা হয়।

তোমার কি ইহজন্মে ছুটী হইবে না? একবার আমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইও। রাসবিহারীবাবু কিছুদিন সপরিবারে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, এখন কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়াছেন। আমি একটু অবকাশ পাইলেই একবার দেশ পর্য্যটনে বাহির হইব সংকল্প করিয়াছি।

তোমার

বিভূতিনাথ।

চতুর্থ পত্র।

ভাই বিভূতি,

সভা সমিতি, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি লইয়া সুখে আছ লিখিয়াছ, সেটা ভাল কথা। যেমন করিয়া হউক, সুখে আছ শুনিলেই সুখী হই। কিন্তু তোমার নামে একটা নালিশ দায়ের হইয়াছে। তোমার পত্নীর সহিত

তোমার নাকি দেখা শুনা হয় না, এই কথা। একবার শুনিয়াছিলাম যে, তুমি তাঁহাকে মনের মত করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিতেছিলে। অথবা তোমার ভাবগতিক বুঝিয়া, তোমার মনেরমত করিবার জন্য, তোমার পিতা তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, তিনি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ বা মমতা প্রদর্শন করেন নাই। তার পর এই নালিশ। একবার নিজে গিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিব, সে সুবিধা হইতেছে না। শীঘ্র কৈফিয়ৎ দিবে।

তুমি দেশ পর্য্যটনে' বাহির হইবে লিখিয়াছ। কিন্তু কোথায় যাইবে লেখ নাই। এবার শীঘ্রই জবাব দিও।

তোমার

বিমলাচরণ।

পঞ্চম পত্র।

ভাই বিমলা,

দুঃখের দিন দুঃখেই যাইবে। আপনাকে সুখী করিবার জন্য যত আয়োজন করিলাম, সকলই বিফল হইল। বিবাহের পর ভাবিয়াছিলাম, যে যখন এক সঙ্গে ঘর সংসার করিতেই হইবে, তখন একটা আপোষ করা ভাল। কিন্তু দেখিলাম, যাহাতে যাহাতে আমার রুচি, ঠিক তাহা-তেই অর্দ্ধাঙ্গিনীর অরুচি। আমি যাহা পরম পবিত্র বোধ করি, তিনি তাহার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চাহেন না। এমন করিয়া কতদিন চলে? যাহার প্রতি ভালবাসা নাই, আসক্তি নাই, তাহাকে সঙ্গিনী

করিয়া, কত দিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করিব ? একা একা বেশ কাটান যায়, আর নিরুপমা ঠাকুরাণীও ইহাতে অসন্তুষ্ট নহেন। তিনি গঙ্গাজল এবং পুতুল সাজান আলমারী লইয়া সুখে আছেন। তিনি যখন সুখে আছেন, তখন অন্য কাহারও নালিশ করিবার অধিকার কি ? উপযুক্ত পক্ষের অভাবে, নালিশি আর্জ্জিখানা সরাসরি ভাবে নামঞ্জুর করিও।

শরীর সুস্থ নয় বলিয়া ডাক্তারের উপদেশে স্থানান্তরে যাইব, কিন্তু এখনও গন্তব্য স্থান স্থির করি নাই।

তোমার
বিভূতিনাথ।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পত্র।

স্নেহের বিমলাচরণ,

* * এই স্থানটি বড় মনোরম। তরঙ্গউৎক্ষেপচঞ্চলা নদী, গৃহসোপানমালা ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পবাটিকা। কোথাও পাখী ডাকিতেছে, কোথাও প্রজাপতি উড়িতেছে, এবং সর্ব্বত্র স্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে। প্রভাত সমীরণে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, একাগ্রচিত্তে তোমাকে পত্র লিখিতেছি। ইচ্ছা হইতেছে যে, পত্র ভরিয়া কেবল নদীর তরঙ্গরঙ্গ, পুষ্পগন্ধ এবং মলয় সমীরণ পাঠাইয়া দিই। কিন্তু বিষাদগাথাই নাকি আমাদের মধুর গীতি, তাই প্রকৃতির সুখগৃহে বসিয়াও দুঃখের কথা লিখিব।

আমার শরীর দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছে ; মানসিক স্ফূর্ত্তি বা উৎসাহ চলিয়া যাইতেছে। যৌবনের প্রারম্ভেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। জীবন-ধারণ সুখকর না হইলেও বাঁচিয়া থাকিতে হয়, ইহাই আশ্চর্য্য।

অনন্তরূপশালিনী প্রকৃতির চরণতলে বসিয়া কিছু কিছু কাব্য আলোচনা করিতেছি, এবং মৃণ্ময়ীকে ইংরাজী কবিতা পড়াইতেছি। ইহার বুদ্ধির প্রখরতা এবং কাব্যানুভূতি এত বেশী, যেন শিক্ষা দিতে গিয়া অনেক স্থলেই শিখিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে। উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিবার জন্য ইহার পিতামাতা বড় আগ্রহ করিতেছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাদের সাহায্য করিতেছি। কিন্তু মেয়েটি কোন প্রকারেই বিবাহে সম্মত হয় না।

রাসবিহারী বাবুর সঙ্গে বাস, বড়ই তৃপ্তিদায়ক। ইনি ধার্ম্মিক পরোপকারী এবং সাহসী। সংস্কারক বলিয়া ইহার জাতি গিয়াছে। যে সমাজে ভদ্রলোকের জাতি যায়, সে সমাজ কতদিন টিঁকিয়া থাকিবে ?

তোমার
বিভূতিনাথ।

দ্বিতীয় পত্র।

প্রিয় বিভূতিনাথ,

মনীষীনাথের পরলোকযাত্রার পর, সংসার তোমার নিকটে জীর্ণারণ্য বলিয়া মনে হইতেছিল, লিখিয়াছিলে। স্বাভাবিক বটে। তাঁহার মত জ্ঞানী এবং সহৃদয় ব্যক্তি এ সমাজে আর কই ? যাঁহারা খ্যাতিলাভের

জন্য সংসারের হাটে প্রতিভার দোকান খোলেন, তাঁহাদের মূঢ়তা এবং ধৃষ্টতা যত দেখি, ততই মনীষীনাথের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। জীবন-বিজ্ঞানের সুতীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ পড়িয়াও, ইহাদের পরলোকগমনে স্বতই মনে হয় যেন "পরত্রগৃহমস্মাকম্"। তোমার পিতৃদেবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার সেবার জন্য রাসবিহারী বাবু সপরিবারে আসিয়াছেন, এ সংবাদে সুখী হইলাম। বৃদ্ধ বয়সের রোগ, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা উৎকণ্ঠার বিষয় হইলেও, সমুচিত সেবায় তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন আশা করি। আমি যে দূরদেশে থাকি, তাহাতে পত্র পাইতে বহু বিলম্ব হয়। শীঘ্র পত্র লিখিও।

তোমার

বিমলাচরণ।

তৃতীয় পত্র।

ভাই বিমলাচরণ,

পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর হইতে, যে সকল কৃত্রিম বন্ধনে সংসারটি বাঁধা ছিল, তাহা শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন প্রথা মানি নাই অর্থাৎ হীন পৌরাণিক প্রথা অবলম্বন করিয়া শ্রাদ্ধাদি করি নাই বলিয়া, নিরূপমা ঠাকুরাণী এবং গৃহের অন্যান্য লোকেরা আমাকে ভিন্ন জাতীয় এবং নিঃসম্পর্কিত বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। ভালবাসা কখনও ছিল না, কিন্তু বাহিরে একটা আবরণের ঠাট ছিল, এখন তাহাও গিয়াছে।

অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বিপদের দিনে আমার একমাত্র সুখ মৃণ্ময়ীর স্নেহলিপি। সে লিখিয়াছে যে, শীঘ্রই এখানে আসিবে এবং রাসবিহারী বাবু নিজে রাখিয়া যাইবেন।

সাধের সমিতিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু সমিতির বন্ধুদিগের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হই নাই। তবে সকলেই আমার মত নিষ্কর্ম্মা নহে এবং কেহ কেহ যশ ও পদমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য রাত্রিদিন ব্যস্ত বলিয়া, পূর্ব্বের মত দেখাশুনা হয় না।

পথভ্রান্ত

বিভূতিনাথ।

চতুর্থ পত্র।

(সারদাপ্রসাদের পত্র।)

প্রিয় বিমলাচরণ,

তোমাকে একটি অনুরোধ করিতেছি। বিভূতিনাথকে লিখিয়া দিও তিনি যেন মৃণ্ময়ীকে গৃহে স্থান না দেন। সন্তানের উপর পিতা মাতার প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী। তাঁহার মাতা যখন তাঁহাকে বিবাহিতা করাইতে চাহেন, তখন তাঁহার আপত্তি ধর্ম্মবিরুদ্ধ। মাতা যাঁহাকে সম্প্রদান করিবেন তাঁহাকেই গ্রহণ করা কন্যার কর্ত্তব্য। কেবল বিবাহের প্রস্তাব এড়াইবার জন্য উনি বিভূতিনাথের গৃহে আসিয়াছেন। বিভূতিনাথ বলিতেছেন যে তাঁহাকে খ্রীষ্টিয়ান কুমারী-আশ্রমে পাঠাইবেন। ঐগুলি বাতুলতা নয় ত কি?

বিভূতিনাথ স্বাস্থ্যের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাইবেন স্থির হইয়াছে। মৃণ্ময়ীও পরিবারবর্গের সহিত যাইবেন কথা হইয়াছে। যান, ক্ষতি নাই;

কিন্তু মাতার কথা অনুসারে নিশ্চয়ই বিবাহ করা উচিত, একথা বিভূতি-নাথ যেন তাহাকে বুঝাইয়া দেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসারদাপ্রসাদ।

পঞ্চম পত্র।

বিমলাচরণ,

বহুদিন পরে তোমাকে পত্র লিখিতেছি। আর কখনও লিখিতে পারিব সে আশা ছিল না। অতিশয় কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়াছিলাম। এখন উঠিয়া বসিয়াছি। এই পীড়ার সময় মৃণ্ময়ী যেরূপ সেবা করিয়াছেন, তাহা ভুলিতে পারিব না। তাঁহারই কৃপায় এবার প্রাণ পাইলাম। রোগে পড়িয়াছি বলিয়া, নিরুপমা ঠাকুরাণীর তীর্থদর্শনে বড় ব্যাঘাত ঘটিতেছে। হিন্দুর অস্পৃশ্য খাদ্য পথ্যরূপে ব্যবহার করি বলিয়া সর্ব্বদা বিরক্ত! স্নেহ, দয়া, প্রভৃতি, যদি গঙ্গাজলের ছড়ার উপর নির্ভর করে, তবে ঐ পবিত্রজলেই উহার বিসর্জ্জন প্রার্থনীয়। মনে করিও না, আমি কাহারও উপর রাগ করিয়াছি; সে অধিকার নাই। অন্যে যে দয়া করিবে, তাহার উপর মৌরশি দাবি নাই। সংসারে নির্ম্মমতাও আছে; নিঃস্বার্থ পরসেবাও আছে। রোগ শয্যায় শুইয়া মৃত্যুকামনা করিয়াছিলাম; কিন্তু বাঁচিয়া উঠিয়া বাঁচিতে সাধ হইয়াছে। এই মনুষ্যপুত্তলিকা লইয়া যিনি ক্রীড়া করিতেছেন, সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

স্নেহের
বিভূতিনাথ।

ষষ্ঠ পত্র।

বিভূতিনাথ,

তোমার পীড়ার সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইতে হয় নাই; একেবারেই আরোগ্য সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীমতী মৃণ্ময়ীদেবীকে আমার সভক্তি নমস্কার জ্ঞাপন করিবে। তোমার সম্পূর্ণ আরোগ্য সংবাদ-পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

তোমার
বিমলাচরণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পত্র।

ভাই বিমলাচরণ,

এখন প্রয়াগধামে আসিয়াছি। রোগে মাথার চুল উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই মস্তক মুণ্ডনের প্রয়োজন হইল না। ইংরাজী jealousy শব্দের বাঙ্গালা কি ভাই? বহুবিবাহের দেশে নায়িকাদিগকে কোপিনী এবং অভিমানিনী দেখিতে পাই, ঐটি কি সেই পদার্থ? যাহাই হউক, নিরুপমা ঠাকুরাণীকে এ সকল ভাবের কোনটিও কদাচ স্পর্শ করিতে পারে না। সকলেরই গুণের প্রশংসা করা যায়।

যাঁহার করুণায় মুক্তিলাভ করিয়াছি, যাঁহার মাহাত্ম্য আমার চিরদিনের আদর্শ, যাঁহার মধুরতা আমার তিক্ত জীবনে একমাত্র উপাদেয় সামগ্রী,

তিনিই আমার মুমুর্ষু হৃদয়কে পুনরুদ্দীপিত করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

এখানে একজন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে সমাজতত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যা লইয়া কথাবার্ত্তা হইয়াছে। বিবাহ-প্রথার উৎপত্তি ও ইতিহাস লইয়া ম্যাক্‌লিনেন্‌ হইতে গ্রাণ্ট আলেন পর্য্যন্ত অনেকের মতের সমালোচনা করা গেল। পুরুষের খলস্বভাব এবং স্ত্রীজাতির পরাধীনতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই প্রথার সৃষ্টি হইত না। যতই দীর্ঘজীবী হউক, মনুষ্য অল্প দিনের জন্যই পৃথিবীতে থাকে। অল্প কয়েকটি দিনের জন্য কপটতা বা গোঁজামিল চালাইবার আবশ্যকতা কি? যাহা স্বস্থ, হিতকর এবং শ্রেয় ও প্রেয়মিশ্রিত, তাহা দুদশজন লোকের ভয়ে করিতে কুণ্ঠিত হওয়া কেন? যাহারা যশলোলুপ বা গৌরবার্থী, সেই দীনহীন কৃপার পাত্রেরা যদি পরের মুখ চাহিয়া চলে, চলুক। কোথায় মনুষ্যত্ব, যদি নিন্দা বা প্রশংসা উপেক্ষা করিতে না পারা যায়? কোন পুণ্যাত্মা এ পর্য্যন্ত এমন কোন সৎকার্য্য করেন নাই, যাহার জন্য তাঁহাকে নিন্দাভাজন হইতে হয় নাই। কোন পাপাত্মা এ পর্য্যন্ত এমন কোন পাপানুষ্ঠান করে নাই, যাহার জন্য কোন না কোন লোক তাহাকে বাহবা দেয় নাই। এরূপ স্থলে লোকের নিন্দার বা প্রশংসার সমানই মূল্য। তুমি কলিকাতা আসিবে লিখিয়াছ; আমরাও গৃহাভিমুখী। বহুদিন পর একসঙ্গে সকল কথা আলোচনা করিব এবং তোমাকে দেখিয়া সুখী হইব।

তোমার

বিভূতিনাথ।

দ্বিতীয় পত্র।

বিভূতিনাথ,

শীঘ্রই একবার স্বদেশ দর্শন কপালে ঘটিবে আশা হইতেছে। তবুও দীর্ঘ পত্র লিখিলাম।

সংবাদপত্রে বক্তাজাতির প্রশংসা পড়িয়া বক্তা হইবার সাধ হইয়াছে। কিন্তু এ অঞ্চলে শ্রোতা দুর্লভ। অনেক বিজ্ঞতা জমিয়া রহিয়াছে; কিন্তু মাতৃভাষার এত অল্পই চাষ করিয়াছি যে, কোন সম্পাদক, আমার জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধগুলি, বঙ্গীয় পাঠকবর্গের হিতকামনায়, মুদ্রিত করিতে রাজি হইবেন না। আমার পাদ্রিগিরি, তোমার উপরেই জারি করিব।

সমাজ কঠোর এবং নির্ম্মম; কিন্তু পাহাড় ভাঙিবার জন্য ঢিল ছুঁড়িলে, ঢিলটিই চূর্ণ হয়। সমাজ বর্ব্বর এবং হিংসাপূর্ণ; কিন্তু কণ্টকে পদাঘাত করিয়া লাভ কি? সমাজ অত্যাচারী এবং উৎপীড়ক; কিন্তু যিনি উৎপীড়িত তিনি একাকী।

একালের সংস্কারকেরা অধিকাংশ স্থলেই সংস্কারের নামে যাহা কিছু ইউরোপীয়, তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। সে জন্য শাসনকর্ত্তাদের জাতীয়েরা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন। তাঁহারাই আমাদের আশ্রয় এবং অবলম্বন বলিয়া, এবং হিন্দুজাতির স্বাধীনতা নাই বলিয়া, নির্ব্বিঘ্নে নূতন সংস্কার চলিতেছে। কিন্তু যে ভাব বা সংস্কার হিন্দু অহিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান, দেশী বিলাতি, সকলের মনের মধ্যে তুল্যভাবে বদ্ধমূল, তাহার বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান আত্মবিনাশের উপায় উদ্ভাবন মাত্র। ব্রাহ্মদের দৃষ্টান্ত দিতেছি,—তাঁহারা প্রতিমা পূজার বিরোধী বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু দেখ, যাহারা ঈশ্বরের একটা লৌকিক ভাবে জাতপুত্র স্বীকার

করে, এবং তাহাকে ঈশ্বর বলে, সেই পৌত্তলিকেরা ইহাদের আদৃত। তাঁহারা নীতিগর্ভ বক্তৃতা করিতে ব্রাহ্মমন্দিরে নিমন্ত্রিত হয়েন। ইহার কারণ এই যে, প্রতিমাপূজা কথাটা উহাদেরই বৃথা; এবং উহাদের সামাজিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মদের আদর্শ। অন্যদিকে দেখ, হিন্দুদের পৌত্তলিকতা প্রতিমাপূজায়। প্রতিমা নামেই, মূর্ত্তির বাস্তবতা অস্বীকৃত। কথায় কথায় তাঁহারা মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া, আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া স্বীকার করেন। নীচতাপ্রাপ্ত বৌদ্ধদের পুত্তলিকা, হিন্দুর সমাজে এখন পূজিত হইলেও, হিন্দুরা তাহার বাস্তবতা মানে না। তথাপি উহাদের কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মেরা আদর করিয়া ডাকেন না। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, এ দৃষ্টান্তে কেবল ইহাই প্রমাণিত হয়, যে ব্রাহ্মেরা ধর্ম্ম অপেক্ষা, কতকগুলি নূতন সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি বেশী সহিষ্ণুশীল। সে কথা ঠিক। কিন্তু এ কথাও প্রতিপন্ন হয় যে, ইউরোপীয় সমাজের একটু ছায়া না পাইলে, অথবা কৃতকার্য্যের জন্য ইংরাজদের বাহবা না পাইলে, ইহাদের চলে না। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, যে নূতন সংস্কার, ইউরোপীয়দের আশ্রয়েই হইতেছে। কিন্তু যিনি বিবাহপ্রথার বিরোধী কোন কার্য্য করিতে বসিবেন, তাঁহাকে সকল সমাজের সমবেত উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে। গ্রাণ্ট আলেন বা লিন্ লিন্টনের নায়িকাদের পবিত্রতা এবং তেজস্বিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু সমাজের উৎপীড়নে, তাঁহারাও যে পিশিয়া গিয়াছিলেন, এ কথাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

কথায় বলে যে, দশ চক্রে ভগবান ভূত। যে যত পবিত্র বা সংযত চিত্ত হউক্‌ না, সকলের বিদ্রূপের কটাক্ষ যদি তাহার উপর পড়ে; সকলে

যদি ঘৃণার অঙ্গুলি তুলিয়া তাহাকে দেখায়, তবে জীবনধারণ সম্ভবপর হয় না। কলিকাতায় বসিয়া এ সকল কথার আলোচনা হইবে। এখন দেখিও, কলিকাতায় যদি পাদ্রিগিরি কর্ম্ম খালি থাকে, আমি যেন সংবাদ পাই।

তোমার

বিমলাচরণ।

তৃতীয় পত্র।

বিমলাবাবু,

শুনিলাম, তুমি কলিকাতা আসিয়াছিলে: কিন্তু কেন যে আমাদের সঙ্গে দেখা কর নাই, তাহা তুমি জান। আর শুনিলাম যে তুমি একটি পাপ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছ। জনরব যে বিভূতিনাথ বৌদ্ধমতে নূতন বিবাহ করিয়াছে; এবং তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে। কে শত্রু, কে মিত্র জানিয়া রাখিবার জন্য, তোমাকে পত্র লিখিলাম। প্রকৃত কথা লিখিবে। বিভূতির পাপমুখ আর দর্শন করিব না।

পূর্ব্ব পরিচিত,

শ্রীশারদাপ্রসাদ।

চতুর্থ পত্র।

(অমেরন্দ্রনাথের পত্র।)

প্রিয় বিমলাচরণ,

আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে বিভূতিনাথের মত পরোপকারী, অমায়িক, সৌজন্যশীল, সুপণ্ডিত এবং সচ্চরিত্র আর কে আছে? তাঁহার নূতন

বিবাহের পর সকলেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল পুণ্যাত্মাই তাঁহাকে পাপিষ্ঠ বলিতেছেন। তাঁহার কলঙ্ক হইয়াছে, হইবেও। আমরা ভিন্ন কে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবে?

যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু আমি যদি পূর্ব্বে এ সকল কথা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে বিভূতিনাথকে বিবাহ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। তিনি যে প্রকার সংযতচিত্ত এবং জিতেন্দ্রিয়, তাহাতে প্রেম এবং অনুরাগ হৃদয়ে পোষন করিয়া, শারীর সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া, সংসারের শত্রুতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন না কি? এ সকল বিষয়ে তোমার মত কি, লিখিবে। সমাজে তাঁহার কার্য্যকারিতা নষ্ট হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছি।

তোমার

অমরেন্দ্রনাথ।

পঞ্চম পত্র।

প্রিয় অমরেন্দ্র,

. . . . . .

বিভূতিনাথের ধর্ম্মবুদ্ধির হিসাবে তিনি অবিবাহিত হইলেও, লোক-সমক্ষে পূর্ব্ব হইতে বিবাহিত ছিলেন। তাহার উপর বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়া বিবাহ! লোকে বিরক্ত হইবে না ত কি? দেশের নীতিসূত্রের কথার একটা তামাসা দেখ। মৃন্ময়ী যদি স্বজাতীয়া হইতেন, তাহা হইলে বহু বিবাহ করিয়াছে, এই পর্য্যন্ত বলিত; কিন্তু রাগ করিত না। সংস্কারকেরাও কিছু বলিতে পারিতেন না। যদি ইংরাজি রকম প্রথায়

বিবাহ রদ করিবার কোন পন্থা থাকিত, তাহা হইলে বিভূতিনাথ যদি সেইরূপ কিছু করিয়া এই বিবাহ করিতেন, কেহই তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারিতেন না।

আমি দেখিতেছি যে সকলেই পাপীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছে। একটা বলিদান, শত শত লোকের মুক্তির হেতু। যাহারা মহাপাপিষ্ঠ, তাহারা এই সুযোগে বিভূতিনাথকে তীব্র কথা বলিয়া, পুণ্যানুরাগী বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের উপায় করিতেছে।

বিবাহ না করিয়া, কেবল মাত্র প্রণয় পোষণ করিয়া থাকা সম্ভবপর ছিল কি না, সে বিষয়ে কিছু বলিতেছি। সে ভাবেও ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছিল, তাহা জান। ভালবাসিয়া চুপ করিয়া থাক, এ কথা লিখিতে ভাল, বলিতে ভাল; কিন্তু অপ্রাকৃতিক। প্রকৃতিতে যদি মনুষ্যত্ব থাকে, অনুরাগে যদি যথার্থতা থাকে, তাহা হইলে মানব মাহাত্ম্যের চরম বিকাশের একমাত্র উপায় এবং হেতুভূত প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে, কেহ মিলনকে উপেক্ষা করিতে পারে না। সৃষ্টির লোকান্তরগত উদ্দেশ্য কি, তাহা জানি না। কিন্তু এই সৃষ্টিতে যদি ঈশ্বরের কোন ইহলোকসাধনী কল্পনা থাকে, তবে তাহা প্রেম-মিলনেই লক্ষিত হয়। যাহারা ক্ষুদ্র পাত্রে জল রাখে, জল তাহাদের আয়ত্তাধীন। তাহারা বলিতে পারে জল ঢালা না ঢালা তাহাদের ইচ্ছা। কিন্তু স্রোতস্বিনী নদীকে কেহ বিজ্ঞতার উপলাবরোধে বাধা দিতে পারে না। জল সেচন করিয়া এবং রবিতাপে রাখিয়া, যে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তাহা মূলতঃ জীবন শূন্য। যেখানে আত্মার প্রতিরূপ আসিয়া আত্মাকে দেখা দেয়, যেখানে প্রণয়স্পর্শে হৃদয় বিকশিত হয়, সেখানে মিলননিবারণ, অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক।

বিভূতিনাথ সমাজের চাপে পিশিয়া মরিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহার পাপ পুণ্যের বিচারক সমাজ নহে। যাঁহার পরম প্রশান্ত আশ্রয় সকলের কাম্য, তিনি তাহাকে আশ্রয় দিবেন। বিভূতিনাথ আমাকে লিখিয়াছেন যে “যাহা আমার চিরশান্তির সহায়, সেই প্রণয় লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমি সংসারের নির্দ্দয়তায় ক্ষুব্ধ নহি ; কারণ যাহা আমার জীবনের পুণ্যফল, তাহাই সমাজের বিচারে আমার কলঙ্ক।” ইং ১৮৯৮ সন।

তোমার স্নেহাধীন

শ্রীবিমলাচরণ।

সুনন্দা।

প্রথম সর্গ।

(নিদাঘে।)

(১)

বসুমিত্র, যুবক শ্রমণ
ভ্রমণ করিত নানা দেশ ;
সুগতের লইতে শরণ
দিত সে কত না উপদেশ।
শীলধর্ম্মে ছিল সে দীক্ষিত,
সুশিক্ষিত, বিনীত, সুমতি ;
নিরাশ্রয়ে যতনে রক্ষিত,
সেবা-ব্রতে ছিল সদা ব্রতী।

(২)

মিথিলার রাজপথ দিয়া --
উদ্বোধিয়া পুরবাসী জনে,
এক দিন গেল সে গাহিয়া—
পুণ্য-গাথা, প্রেমপূর্ণ মনে ;—
"কৃপাময় বুদ্ধ অবতার
লভ তাঁর করুণার কণা ;
"দূরে ফেল ছার ভব-ভার,
রহিবেনা জনম-যাতনা।"

(৩)

ধনী এক বণিক-দুহিতা—
বিমোহিতা সে বাণী শ্রবণে,
গৃহ প্রান্তে-- লাজ-সঙ্কুচিতা—
প্রণমিল যুবক শ্রমণে।
বসুমিত্র গেল আশীষিয়া,
কি ভাবিয়া, পশিল না কানে
কুমারী সে বিষাদে শ্বসিয়া
চাহিয়া রহিল পথ পানে।

(৪)

বসুমিত্র, পুণ্যগাথা গাহি
পথ বাহি তেজিলা মিথিলা।

"যৌবনের স্বপ্নে সুখ নাহি,"
মনে মনে সুনন্দা চিন্তিলা।
কুমারী সুনন্দা ভাবে মনে,
যাবে বনে, তেজিবে সংসার।
উন্মোচিবে, যেবা আবরণে
চিত্ত-গৃহ নিত্য অন্ধকার।

(৫)

অস্ত গেল নিদাঘের দিবা,
বিভাবরী আনিল আঁধার।
হর্ম্ম্যতলে নত করি গ্রীবা
সুনন্দা বাজায় তন্ত্রীতার
তন্ত্রীসহ কণ্ঠের মিলন ;
কি শোভন সঙ্গীত বাজিল।
বৈশাখের নৈশ সমীরণ
মূর্চ্ছনায় মরমি কাঁপিল।

(গীতি)

নিশ্বাস ফেলি, সম্ভাষি ফুলে সমীরণ গেল কহিয়া ;
"দক্ষিণ হতে ভীষণ গ্রীষ্ম আসিছে বিশ দহিয়া।"
নত, ব্যথিত অন্তরে
ফুল-কলিকা,
মর্ম্মের দুখে মর্ম্মরে
তরু লতিকা।

মলিন হইল শ্যামল শষ্প তরাসে ;
শীতল সলিল-শীকর শুষ্ক হতাশে।
গৌরবে রবি-কিরণে
শোভে ত্রিভুবন ;
কর্ম্মের তাপে দীপনে
যথা যৌবন।
শঙ্কর দিঠি ফুটিয়া উঠিল স্বরযে ;
রতি সম বনে বেদনায় ছায়া মূরছে।
শৈশব নাশি' যৌবন আসে ; বসন্ত যায় চলিয়া।
দক্ষিণ পথে অগ্নির রথে নিদাঘ আসেরে ঝলিয়া।

দ্বিতীয় সর্গ।

(গঙ্গাতীরে)

গঙ্গাতীরে দ্বিপ্রহরে,—তেয়াগি ভোগ-বাসনা-
করিছে বসুমিত্র বসি কঠোর যোগ সাধনা।
লহরী তুলি শীতল জলে, গঙ্গা চলে মন্থরে ;
তপ্ত ভানু-কিরণ-কণা মাঝারে তার সন্তরে।
শ্রমণ-চিত জগতাতীত সুগত-কৃপা-সাগরে
ডুবি, পরম নির্ব্বাণের শান্তি যাচে কাতরে।

অদূরে তীর-তরুর তলে তেয়াগিনী সুনন্দা
ভাবিছে, কবে এমনি হবে মুক্ত সুখ-পন্থা !

শ্রমণ-মুখে নিরখে বালা দীপ্তিমাখা শান্তি ;
কিরণ মাখা গঙ্গাজল জিনিয়া যার কান্তি।
স্তব্ধ আঁখি ; রহিল বালা মুগ্ধ মনে বসিয়া ;
চিত্ত হতে জগতখানি বিজনে পড়ে খসিয়া।
ললাট পটে বক্ষ তটে মুক্তাসম ঘর্ম্মজল,
আঁচল পড়ে ভূতলে লুটে, পবনে ওড়ে কুন্তল।

আসিল অপরাহ্ণ পরে, টলিল বেলা পশ্চিমে ;
শোভিল নব-যুবতী-তনু কিরণ রাগ রক্তিমে।
সমাধি শেষে হেরিয়া তারে, শ্রমণ বসুমিত্র,
চলিল দ্রুত আপনা পথে ফিরায়ে নিয়ে নেত্র।
সুনন্দা কহে ডাকিয়া তায়,— "যেওনা প্রভু রহগো!
"ত্যাগিনী আমি, আমারে তুমি মোক্ষ পথ দেহ গো!
"দীক্ষা নিতে এসেছি গুরু, শিক্ষা দেহ নির্ব্বাণে ;
"তোমারি মধু বচন শুনি আসিনু তব সন্ধানে।"

থমকি ফিরি কহিল বসুমিত্র মৃদু বচনে ;—
"রমণী তুমি, রূপসী তুমি, তরুণী তুমি ললনে।
"শ্রমণ সহ গমন তব বিহিত নহে, কামিনী ;
"অনূপ গ্রামে স্বামিনী সহ কাটাও আজি যামিনী।
"রমণী-মঠে ভিক্ষুণীর সঙ্গে যেও।" বলিয়া—
সুগত পদ স্মরিয়া বসুমিত্র গেল চলিয়া।

কাঁদিল বসি গঙ্গাতীরে সঙ্গহীনা কামিনী ;
সন্ধ্যা হ'ল, রাত্রি এলো, কাটিয়া গেল যামিনী।
পুরুষ বেশে সাজিবে বলি করিল শেষে যুকতি ;
শীতলি তনু গঙ্গাজলে নগরে গেল যুবতী।
যতনে বালা জটারজাল, চাচর কেশে রচিল,
পরিয়া রুরুচর্ম্ম বুকে উরজ শোভা ছাদিল।
চিনিতে আর পারিবে কেবা ? মাখিল মুখ গৈরিকে।
ভাবিল, হবে নারীর আর মুক্তি-পথে বৈরী কে ?
নগরে কেহ রমণী বলি চিনিতে যবে নারিল,
সুগত পদ সেবিতে বালা গাহিয়া গাথা চলিল।

(গাথা)

মেলিয়া আঁখি জগতজন চাহরে।
প্রভাতী গীতে সুগতগুণ গাহরে।
কাটিল মায়ার যামিনী ;
আজি সুখে গাও।
শয়নে, নয়নে, কামিনী
তেজি দূরে যাও।
কি সুখ-আশে রহিবে বাসে বল না ?
এ গৃহধামে প্রীতির নামে ছলনা।
রূপ বিকশিছে ধরণী ;
সে যে মোহ-পাশ।
মার বধূ ভবে রমণী ;
ছাড় গৃহবাস।

তৃতীয় সর্গ ।

(কুটীরে)

রোগশীর্ণ বসুমিত্র ছিল শয্যাগত
পর্ণ কুটীরের মাঝে ! নিকটে নিয়ত
রহিত সুনন্দা সাজি বালক শ্রমণ ;
দিত সে ঔষধ পথ্য সেবিত চরণ ।
উরুপরে কভু তার তুলে নিয়ে মাথা,
শুনাইত মধুমাখা থেরা থেরী গাথা ।

সেবায় যতনে যবে স্বাস্থ্য এল ফিরে,
একদিন বসুমিত্র যষ্টিকরে ধীরে—
বাহিরিল ক্ষীণ দেহে নগর ভ্রমিতে ;
হেরিয়া সুনন্দা ধেয়ে আসিয়া ত্বরিতে
কহিল, কোথায় যাও ? যাক্ দুটি দিন ।
চরণে নাহিযে বল, তনু খানি ক্ষীণ ।

বসুমিত্র কহে হাসি ;—"সুব্রত, তোমার
এ যতনে পড়ে মনে বিস্মৃত সংসার ।
যতটুকু আছে শক্তি, সুগত সেবায়
নিয়োজিব ; নাহি সুখ বসিয়া হেথায় ।
আলস্যে কুটীরে দেহ দগ্ধ হয় তাপে ।"
শুনি বাণী সুনন্দার ঠোঁট খানি কাঁপে ।

সুনন্দা চলিল সঙ্গে ; বসুমিত্র তায়
নিষেধিয়া ধীর পদে একা চলি যায় ;
আদেশে সুনন্দা গেল ভিন্ন পথ দিয়া ;
বাধিল বড়ই প্রাণে ; কাঁদে তার হিয়া।
দূরে এক বন প্রান্তে নিভৃতে বসিয়া
ইঙ্গিতে যাতনা তার কহিল গাহিয়া।

(গান)

চলিছ কোথা পথিক হে
মনের ভুলে ?
বেলা যে হেথা অধিক হে,
বনের কূলে।
এ বনে ঘন ছায়ার মাঝে
পাতায় বাঁধা আলয় আছে ;
অতিথি রহ পথিক সেহি কুটীরে।
শান্তি পাবে, ক্লান্তি যাবে টুটিরে।
আদরে মোরে ডাকে কেরে
মায়ার ছলে ?
আমারে রবি রাখে যেরে
ছায়ার তলে।
তরুর তল চাহি না বনে
তাপিত তনু নহে তপনে।
সুশীত ছায়া আমার কায়া দগধে।
অতিথি নহি, পথিক আমি জগতে।

অন্যদিকে বসুমিত্র পথে যেতে, ভুলে
বসিল বটের মূলে সরসীর কূলে।
ভাবিল এ কোথাকার বালক শ্রমণ
কিনিয়া আমার চিত্ত করিছে যতন ?
কেন এরে ভালবাসি ? এযে বড় ধাঁধা !
নির্ব্বাণের পথে মোর একি গুরু বাধা ?

ঝলসিছে তরু শিরে প্রভাতের আলো ;
সরসীতে খেলা করে ছায়াটুকু কালো।
ঝঙ্কারি বিহগ গায় মাতায়ে পরাণ ;
পরিপূর্ণ যেন শূন্য অসীম বিমান।
"পড়িয়াছি মোহে স্বপ্নে" ভাবিয়া অন্তরে,
দৃঢ় করি চিত্ত তার চলিল প্রান্তরে।

(শ্রমণের গান)

(১)

জীবন ঝলে কানন শিরে আলোকে মাখা।
মৃত্যু খেলে অন্ধকারে পাতায় ঢাকা।
কোকিল-কণ্ঠে গাহিয়া,
কুসুম-নয়নে চাহিয়া,
কানন ডাকি কহিছে ; "ওরে ভ্রমিবে এসো
"শ্রান্তি যবে আসিবে ধীরে ছায়ায় বোসো।"

(২)

প্রখর রবি শূন্য মাঠে দহিছে তাপে ।
চলিতে পদ আর না ওঠে তরাসে কাঁপে
স্বরভি আসি বহিয়া
গোপনে গেল কহিযা ;—
"স্বপ্নতরু আছেরে লুটে ছায়ার মাঝে ,
বাসনা-ফল বড়ই মিঠে পেকেছে গাছে ।

(৩)

যাবরে সেঁহি কাননে আমি বিজন পথে ;
ডেকো না মোরে শূন্য ভূমি পিছন হ'তে ।
পারি না তাপ সহিতে—
কণ্ঠ শিলা বহিতে ।
কাঁদিয়া মরি দিবস যামী , কবে স্বধাও ?
নীরস অতি কঠোর তুমি চলিয়ে যাও !

(৪)

গভীর রবে কহিছে কথা সাধনা ডাকি ,
"সুখের কথা ভুলিয়া হেথা দু'জনে থাকি
ওরে প্রাণের সাধনা,
তোমারি তরে ভাবনা ।
সুখের পথে নিয়ত বাধা তুমি গো জানি ।
শুনিব তবু তোমারি কথা সাধনা রাণী ।

চতুর্থ সর্গ।

(বর্ষায়)

ছিল বিধি :—বর্ষাকালে যতেক শ্রমণ—
যত ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা তেজিয়া ভ্রমণ
রহিত বিহারে চৈত্যে শাস্ত্র আলোচনে,
কিম্বা তপস্যায় সিদ্ধি লভিতে যতনে।
সুনন্দা সুব্রত নামে বসুমিত্র পাশে
ছিল রাজগৃহে এক বিহার আবাসে।

পরম নির্ব্বাণ তত্ত্ব কহিতে কহিতে
ডুবিতেন বসুমিত্র ধ্যানে সমাধিতে ;
সুনন্দা বিমুগ্ধ নেত্রে চাহি মুখপানে
ভুলিয়া সে তত্ত্ব কথা উচ্ছ্বসিত প্রাণে—
ভাবিত, শ্রমণ পদে সঁপিলে যৌবন
লভিবে সে চিত্তশুদ্ধি, মুকতি রতন।
সহসা একদা বালা চমকি তরাসে
কহিল আপন মনে, "হায় কিবা আশে
এসেছিনু গৃহ তেজি ? আজি কি কামনা
উৎসরিছে চিত্তমাঝে ? কোথায় সাধনা ?
দেবতার মোক্ষপথে বাধা হ'তে চাই ?
সত্য মোরা মারবধূ, আগে বুঝি নাই।"

সংযমেতে চিত্ত তার যতনে বাঁধিতে
অথবা খুলিয়া প্রাণ বিজনে কাঁদিতে
দূরে এক শিলাতলে বসিল সুন্দরী।
হেরি নভে ঘনঘটা পারে না সম্বরি
রাখিতে চঞ্চল চিত্ত ; ফুকারি কাঁদিল।
গুরুধ্বনি করি মেঘ গগনে নাদিল।

(গান)

তরু নিঃস্বন বন-পবনে,
গুরু গর্জ্জন ঘন গগনে,
ভীরু চঞ্চলা কাঁপে সঘনে,
কিবা ব্যথা ভরে ?
পবন ! কোথায় ধাওরে ?
হে ঘন কি গান গাওরে ?
চঞ্চলা কারে চাওরে ?
তোরা কথা করে।
বারি ঝর্ঝর ঝরে ভূতলে,
গিরি নির্ঝর যেরে উথলে ;
হেরি কেন তা চিত্ত বিফলে
ধেয়ে যেতে চায় ?
মথিছে বক্ষ কু আশা,
ভাসিছে চক্ষে কুয়াসা ;
দহিছে কণ্ঠ পিপাসা ;
বারি কোথা হায় ?

তরু নিঃস্বন সহ শ্বসিব,
গুরু গর্জ্জনে কেঁদে ভাসিব,
ভীরু চঞ্চলা সম কাঁপিব
দুখে অনিবার।
না, না, সংযমে দুখ চাহিব।
কেন ক্রন্দনে সুখ নাহি গো।
কেন বিজনে বৃথায় ঢালিব
এ বিষাদ আর?

গভীর নিশায় বালা সিক্ত কলেবরে
ফিরিল আশ্রমে। তথা ছিল তার তরে
বসুমিত্র অপেক্ষিয়া; সস্নেহে তাহায়
জিজ্ঞাসিলা, "হে সুব্রত, আজি এ নিশায়
কোথা ছিলে? অগ্নিতাপে শুকাও বসন;
কহ মোরে কি সাধনা করিলে কখন।"
বরষায় দেহ সিক্ত, প্রেমে সিক্ত প্রাণ।
আজি এ সস্নেহ ভাষে তুলিয়া বয়ান
কহিল সুনন্দা;—"দেব, সাঙ্গ ছদ্মলীলা!
"মনে পড়ে একদিন গেছিলে মিথিলা?
"শুনি পুণ্যগাথা তব তেজিয়া সংসার,
"এসেছিনু দীক্ষা নিতে চরণে তোমার।

"মনে পড়ে একদিন গঙ্গাকূলে একা
তোমার সাধনা অন্তে হয়েছিল দেখা ;
আমি সে কামিনী দেব মুক্তির পিয়াসী
লভিনু অমূল্য শিক্ষা ছদ্মবেশে আসি ।
সুনন্দা আমার নাম রাখিও স্মরণে ;
হে গুরু বিদায় আজি ; প্রণাম চরণে ।
জানিয়া রমণী তারে, নিশায় এখন
গৃহেতে রাখিতে কভু পারে না শ্রমণ ।
বহিছে শাবণ ধারা, আঁধার যামিনী,
হেনকালে একা কোথা যাবে সে কামিনী
এ বিহারে নারী বলি দিয়া পরিচয়
ভিক্ষুণীর কক্ষে রাখা সম্ভবতো নয় ।
স্নেহেতে সেবায় তার বাঁধা ছিল প্রাণ ,
গমনে নাদিয়ে বাধা, হয়ে আগুয়ান
সঙ্গেতে চলিল তার শ্রমণ তখন ;
নিস্তব্ধে তিতিয়া জলে চলিল দু'জন ।
দূর পথে পরে যবে হইল প্রভাত,
সুনন্দা বিদায় নিল করি প্রণিপাত ।
যুবতীর কান্তি ব্যক্ত সিক্ত দেহ ভরি ।
কিন্তু সে করুণাময়ী ! স্নেহ তার স্মরি
মুখ ফিরাইয়া নিতে কাঁদিল শ্রমণ ।
মেঘ ভাঙ্গি ধীরে ধীরে উদিল তপন ।

ফিরিল বিহার বাসে বসুমিত্র ত্বরা।
রহিল সুনন্দা কথা কক্ষ বক্ষ ভরা।

পঞ্চম সর্গ।

(শরদে)

অনূপ গ্রামের প্রান্তে স্বামিনীর মুখে
সুনন্দা শুনিতেছিল, আনন্দ কেমনে
লভিল ভুবিত লোক সুগত সেবায় ;
চম্পার গর্ব্বিতা রাণী চম্পক কাননে
কেমনে সরসী তীরে করিল সাধনা,
কেমনে সভক্তি চিত্তে বারবিলাসিনী,
সুগতে আতিথ্যদানে করিল সঞ্চয়
মহাপুণ্য ; নারী শূদ্র সকলের তরে
মুক্ত তথাগত পদ, মুক্তি জীবনের।
সুনন্দা শুনিল কথা ভাসি আঁখিজলে।
আম্র কাননের তীরে পূর্ণচন্দ্র পরে
নির্ম্মল শারদাকাশে উদিল যখন,
সুনন্দা গঙ্গার কূলে গিয়া একাকিনী
বসিল ; একদা যথা নিদাঘের দিনে
বসুমিত্রে ধ্যানমগ্ন হেরেছিল বালা।
সে পূত তীর্থের ধূলি তুলিয়া যতনে

মাখিল কম্পিত বক্ষে প্রতপ্ত ললাটে,
চুম্বিল পিপাসা শুষ্ক কোমল অধরে।
জীবন-যজ্ঞের শেষে ভস্ম রহে সার ;
নিষ্কাম সাধনা আনে চরম নির্ব্বাণ।
প্রান্তরে ভাসিতেছিল শারদ চন্দ্রিকা
প্রেমমুগ্ধা প্রমদার স্বপনের মত।
বিজনে কাঁপিতেছিল ধীর সমীরণে
তরুতলে ক্ষীণছায়া, বিরহিনী যথা—
লুকাইয়ে গুরুজনে কাঁপে ব্যথা ভরে।
সুস্মিতা শারদলক্ষ্মী লাবণ্য বিকাশি
উতরিয়া গঙ্গাজলে দুলায়ে অঞ্চল—
(খচিত উজ্জ্বল তারা-মুকুতা-হীরায়)
পূত মার্জ্জনায় তনু করি দীপ্ততর
মোহিত করিতেছিল বিশ্বের নয়ন।
"ব্রাহ্মণ-বিধান তবে সত্য বুঝি হ'বে,"
ভাবিল সুনন্দা ;—"নারী অধিকারহীনা
"একাকিনী করিবারে ধর্ম্মের সাধনা ;
"জীবন যৌবন সঁপি পতি-পদতলে
"পায় নারী মুক্তি তার পরম নির্ব্বাণ।—
"অথবা কামনা মম মারের প্রেরণা,
"ঘুরাতে সংসারচক্রে জন্মজন্মান্তরে
"এ ক্ষুদ্র জীবন ? দেব ! দেহ তুমি আলো,

"কর গো সন্দিগ্ধ চিত্ত জ্ঞানেতে উজ্জ্বল ;
"অভেদে রমণী শূদ্রে করুণা তোমার।"
ধীর পদে পার্শ্বে আসি বসুমিত্র তথা—
কহিলা সম্ভাষি : "ওগো সুব্রত আমার,
"চলিয়াছি থানেশ্বরে ; আসিনু জানিতে
"কেমনে কোথায় আছ, করিয়ে সন্ধান।"
কাঁপিয়া সুনন্দা তাঁরে করিল প্রণাম।
বসুমিত্র কহে ; পূর্ব্ব পরিচয়কথা—
গোপনে রাখিও তুমি। সুযোগ লভিয়া
জিজ্ঞাসি কুশল তব আসিব যাইব।
অবিচারে এসংসারে রটে মিথ্যাবাদ ;
কলঙ্ক রমণী ভাগ্যে জীবন্ত মরণ।"
চাহি তাঁর মুখ পানে কম্পিত বচনে
কহিল সুনন্দা যুক্ত করি করযুগ,
প্রভুগো এসোনা আর দিতে দরশন
"পরিচয়ে হয় যদি কলঙ্ক জগতে।
"খ্যাতি তব এ ভারতে আজি প্রতিষ্ঠিত ,
"সম্মানিত হবে তুমি হর্ষবর্দ্ধনের
"স্বদেশ বিদেশাগত পণ্ডিত সমাজে।
"চীনের ভ্রমণকারী শিষ্য তব শুনি।
"তুমি হবে সংঘপতি ; সুনন্দার তরে
"কোরো না উজ্জ্বলযশ সন্দেহে মলিন।"

কাঁপিল শ্রমণ বক্ষ, জাগিল বেদনা।
সুনন্দা রচিল যেন নব প্রহেলিকা;
বসুমিত্র—অভিধর্ম্ম কোষ ব্যাখ্যা কার—
অক্ষম হইল চিত্ত-গ্রন্থের ব্যাখ্যানে।
কহিল সুনন্দা পুনঃ, "একাকিনী নারী,
রহিও না পার্শ্বে তার; যাও নিজপথে।'
সুনন্দা চলিল গৃহে; বসুমিত্র, হায়,
কি কহিবে না বুঝিয়া তেজিল সে ঠাঁই।
হেরিলা শ্রমণ আজি গমন সময়ে
প্রশান্ত রমণীমূর্ত্তি দীপ্তিমাখা তনু।
যতদূর যায় তত চিত্ত মাঝে তাঁর
আলোকে ফুটিয়া ওঠে ছবি তরুণীর।
বৃক্ষ অন্তরালে দূরে রহিয়া সুন্দরী
হেরিল তাহারে যেতে; লুটায়ে ধরায়
তার পরে শর বিদ্ধা বিহঙ্গিনী সম
আঁধারে প্রেমের পক্ষ ঝাপটিল বালা।
জানিয়া অনন্ত বাধা জীবনের পথে
গাহিল করুণ কণ্ঠে কাঁদিয়া সন্তাপে।

(গান)

ধূলিলুণ্ঠিতা ছায়া কাঁপিয়া বলে :—
ওহে সুধাকর!
মোরে কিরণ-নয়নে হেরিও না।

থাকি শঙ্কিতা সদা তরুর তলে ।
পাতা ঢাকা ঘর
ভেদি' কালিমা কুড়াতে আসিও না ।
রহি উচ্চ গগন-আসনে তুমি—
ঢালি করধারা
কর গৌরব যশ অধিকার ;
হায় ধরার মুক্ত হৃদয়-ভূমি !
থাক বুক ভরা
ঘন বিজন বিপিনে অন্ধকার ।

৬ষ্ঠ সর্গ ।

(বিহারে)

সংঘপতি বসুমিত্র ; সুখ্যাতি তাহার
কিবা গ্রাম, কি নগর, গৃহ বা বিহার
সর্ব্বত্র হইল গীত । শুনি প্রাণ ভরি-
সে বারতা আনন্দিতা সুনন্দা সুন্দরী ।
অনুপ গ্রামেতে তিনি করি আগমন
ভিক্ষুণীগণের তরে বিহার ভবন
করিলেন প্রতিষ্ঠিত ; তাহাদেরি তরে
সুব্রত নামেতে সর, নির্ম্মিলেন পরে ।
সুনন্দা ভিক্ষুণীব্রত করিয়া গ্রহণ
রহিল বিহার ধামে ; জীবন মরণ

সঁপি তথাগত পদে। সত্য কি তাহার
হইল নির্ব্বাণ মুক্তি প্রেম বাসনার ?
একদিন যুবতীরে আবাসে আনিয়া
স্বামিনী কহেন কথা স্নেহে সম্ভাষিয়া—
"গোপনে বাড়িছে কথা ; ছদ্মবেশ ধরি
সংঘপতি সহ তুমি ছিলে কি সুন্দরী ?"
"ছিল কি সুব্রত নাম ? যেনামেতে হেথা
প্রতিষ্ঠিত সরোবর ? সত্য কহ কথা।"
শুকাইল মুখ কথা শুনিতে শুনিতে ;
শিরে হাত দিয়া বালা বসিল কাঁদিতে।
স্নেহেতে ধরিয়া বুকে কহেন স্বামিনী,
"মিথ্যা যদি কহ তাহা ; কলঙ্ক যামিনী
প্রভাত হইবে সত্য আলোকে আবার,
নিষ্কলঙ্ক বসুমিত্র জানিবে সংসার।"
কহিল সুনন্দা তাঁরে, তুলি মুখ তার :—
"নিষ্কলঙ্ক বসুমিত্র জানুক সংসার।"
"ভাগ্যহীনা আমি বৃথা পূজিনু সুগতে ;
কামিনী মারের দাসী বিখ্যাত জগতে।"
কহিল স্বামিনী তারে, "প্রমাণ লইয়া
গোপনে শ্রমণগণ হেথায় আসিয়া
জিজ্ঞাসি তোমারে কথা করিবে বিচার।"
শুনি শুকাইল মুখ পুনঃ সুনন্দার।

সহসা অকালে মেঘ করিল গর্জ্জন ;
অস্ত না যাইতে সূর্য্য, ভীষণ পবন
ধূলির ঝটিকা তুলি আবরিল ধরা :
দীপিল পশ্চিমাকাশ রক্তবর্ণে ভরা।
ধসর উন্মত্ত সেহি ঝটিকার মাঝে,
সুরঞ্জিত সেহি দীপ্ত বর্ণ যেন রাজে—
ধূর্জ্জটির বামে দেবী ভবানীর প্রায় ;
বাহন বৃষভ সম বজ্র ডেকে যায়।
তবু'ও বিদায় লভি ভিক্ষুণী যুবতী
চলিল বিহার মুখে অতি দ্রুত গতি।
ঝটিকারে ডেকে বালা, কহে মনে মনে
"আনগো প্রলয় আন, মানব ভবনে !"

৭ম সর্গ।

(বসন্ত প্রভাতে)

(১)

নীল অসীম বিতান-মণ্ডিত—
নব অরুণ কিরণ-রঞ্জিত
মণ্ডপে আজি আহূত প্রভাত-সমিতি।
গাহে বিহঙ্গ করি উদ্বোধন
এহি সঙ্গীতে মোহি ত্রিভুবন,
"কলঙ্ক হীনা সুন্দরী অতি প্রকৃতি।"

(২)

জাগি   শ্রমণ শ্রমণী সকলে

চলে   স্নান সমাপিতে সদলে

গঙ্গাসলিলে, সুব্রত-সরে, ত্বরিতে।

বহে   শীতল সমীর মন্দে,

মাতি   মধুর কুসুম-গন্ধে।

বসন্ত কত সুন্দর এহি মহীতে!

(৩)

হের'   সুব্রত-সর ঝলকে

রাঙা   রবির তরুণ আলোকে,

ভিক্ষুণীগণ অবতরে চারুতীর্থ।

অতি   স্বচ্ছ শীতল সরসী,

দেবে   নির্ব্বাণ সম বরষি

অঙ্গ ভরিয়া সন্তাপহরা শৈত্য।

(৪)

আসি   উতরিতে জলে, চমকি

কাঁদি   স্বামিনী কহিল নিরখি:-

"সুনন্দা ওই সলিল মাঝারে নিদ্রিতা!'

শোভে   নীল জলতলে অবলা,

যেন   বিষ্ণুবক্ষে কমলা—

অনন্ত শয্যা উপরে আহেরে শায়িত!

(৫)

নাহি জীবনের তাপ আর গো !

গেছে চিন্তার গুরু ভার গো !

কোথারে বিহারে শ্রমণ-সংঘ-সমিতি ।

আজি সঙ্গীত জাগে প্রভাতে

ওই অসীম বিশ্ব সভাতে —

"কলঙ্ক-হীনা সুন্দরী এহি যুবতী ।"

মেলা ও সোহেলা।

(কুলিকাহিনী)

(১)

বামণ্ডা * নামেতে রাজ্য উৎকল সীমায়,
বেষ্টিত অনুচ্চ শত শৈলের প্রাকারে,
উন্মোচিয়া আবরণ, নির্জ্জনে যথায়,
প্রকৃতি, আপনা রূপ আপনি নেহারে।

কোথা বা প্রপাতধারা, প্রেমধারা সম—
ধরণীর বক্ষে শৈল, করে বরষণ;
প্রসারি কানন শাখা তাই অনুপম,
আনন্দে করিছে ধরা তারে আলিঙ্গন।

---

* প্রচলিত নাম বামড়া (Bamra); একটী ফিউডেটরী রাজ্য।

এঃ

চঞ্চলা বালিকা সম নাচিয়া গাহিয়া,
　শৈলে শৈলে নির্ঝরিণী ছোটে নিরন্তর ;
কভু বা চমকি চাহি' পড়ে বা ঢলিয়া,
　শুনি "আয় কোলে আয়" ধরার আদর। ৩

নেয়ালি,* চামেলি, বেলি, জুঁই, কর্ণিকার,
　সাজাইয়া থরে থরে লতায় পাতায়,
কচি বুকে দেয় ধরা পরাইয়া হার ;
　ক্রীড়াচ্ছলে আদরিণী ছিঁড়িয়া পালায়। ৪

অক্লান্ত বহিছে বনে সদা সমীরণ,
　অক্লান্ত মর্ম্মরে মৃদু পত্র সুশ্যামল .
অক্লান্ত চিত্রিত মৃগযূথ অনুক্ষণ
　পরাজি পবনে রঙ্গে ছুটিছে চঞ্চল। ৫

পত্রে পত্রে বিহগের কণ্ঠ-সুধা-ধারা,
　কাননে শিশির বিন্দু সহ পড়ে ঝরি ;
নিস্তব্ধ হরিণগুলি ; স্থির আঁখিতারা,
　পান করে সে মাধুরী দুটি কর্ণ ভরি। ৬

অমিশ্র আনন্দচ্ছবি দেখিবার তরে
　অভিলাষ আছে যার আইস হেথায় ;

---

* বনপুষ্প বিশেষ ; উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের বন্য ফুল।

আমি কি চিত্রিব ক্ষীণ কল্পনার বরে,
অনুপম চিত্রে যাহা চিত্রিত ধরায়? ৭

ওই হের আনন্দের দৃশ্য মনোহর;
শৈল পাদে, শ্যাম-শস্য-প্লাবিত প্রান্তরে,
ভূগের কুটীরগুলি: যথা নিরন্তর
কোল জাতি করে বাস সানন্দ অন্তরে। ৮

শ্রমে হর্ষে যাপে দিন পুরুষ রমণী:
জানে না ছলনা মিথ্যা কিম্বা ব্যভিচার;
কভু নৃত্য গীতে সবে কাটায় রজনী;
পবিত্র কলঙ্ক শূন্য হৃদয় সবার। ৯

উৎকলীয় গঙ্গাবংশ মুখোজ্জ্বলকারী;
সুপণ্ডিত, ন্যায়বান, করুণা ভূষণ,
নৃপতি সুটলদেব, দিব্য গুণধারী,
এ বিস্তীর্ণ রম্য রাজ্য করেন শাসন। ১০

বহু ভূমি, বহু শস্য, অল্প রাজকর;
সুরক্ষিত ধন প্রাণ, সতত নির্ভয়,
অভাবের গুরু চিন্তা দহে না অন্তর;
ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র লাভে পরিতৃপ্ত হয়। ১১

বিস্তীর্ণ পর্ব্বত বন লভিয়া নিষ্কর,
লভিয়া প্রচুর খাদ্য যথায় তথায়,
তৃণ পত্র সংগ্রহিয়ে রচি ক্ষুদ্র ঘর,
সুখে করে কোলজাতি বসতি হেথায়।

—:*:—

(২)

নাতিখর্ব্বদেহ, দৃঢ় পেশী সুগঠিত:
শ্রমে নহে ক্লান্ত কভু, নিত্য হৃষ্ট চিত,
মাঝিয়া নামেতে কোল গ্রামের সর্দ্দার;
চিমিনী তাহার পত্নী, এক মেয়ে তার
গৃহের আদরে মেয়ে—মেনা তার নাম।
নাতিকৃশ কান্ত বপু বড়ই সুঠাম।
কুচ্‌কুচে কাল মেয়ে গাল ভরা হাসি,
চঞ্চল নয়ন দুটি বর্ষে আলো রাশি।
সবে মাত্র চতুর্দ্দশ বরষ বয়স,
সবেতো যৌবন দেহ করেছে পরশ:
এখনো বালিকা তাই প্রফুল্ল অন্তরে
কানন প্রান্তরময় ছুটে খেলা করে।
রাঙ্গা মাটি দিয়ে বালা রঙ্গিয়ে বসন,
কাননের ফুলে করি কবরী ভূষণ,
যে আনন্দ লভে প্রাণে, কণামাত্র তার—
কভু নাহি ঘটে ভাগ্যে রাজ-দুহিতার।

কিন্তুরে বসন্তে বনে আপনা আপনি
ফুটে উঠে মর্ম্মগীতি মধু কুহুধ্বনি ;
প্রেমের লালসা হায় তেমনি চঞ্চল
করে প্রাণ, যৌবনের পরশে কেবল।
কি ক্ষণে কখন বালা কি চোখে হেরিল
কোল যুবা সোহেলারে, অমনি হারিল
এ উহার মন প্রাণ ; জানে না তা কবি ;
বুঝিবা রহস্যময় এ জগতে সবি।
কুমুদ ফুটিয়া উঠে চাঁদের কিরণে,
মোদে আঁখি সরোজিনী সে ছবি দর্শনে।
কোথা থাকে কার চোখে কিবা আকর্ষণ,
কার তাহে টানে প্রাণ, বুঝিনি কখন।
পিতার আদর স্নেহ, মার ভালবাসা,
তাহে আর বালিকার মেটেনা পিপাসা।
আপনার জন যারা করিল যতন,
তা সবে ছাড়িয়া প্রাণ চাহে অন্য জন।
নয়নের তৃপ্তি সুধু তারে চোখে দেখা ;
অগণ্য লোকের মাঝে সেই সুধু একা
অঙ্কিত মানস পটে সজনে বিজনে ;
এগূঢ় রহস্য বল বুঝিবে কেমনে ?
বোঝেনি চিমিনী, তত্ত্ব জানে না মাঝিয়া,
কিবা ছিল কি হয়েছে বালিকার হিয়া।

কহিত সে বাপ মায় যবে যা ভাবিত,
কভু আগে লুকাইয়া কিছু না রাখিত ;
ছিল এক সেতু বাঁধা মুখ হতে মনে,
রহিত না কোন কথা তাইত গোপনে ।
প্রেমের বন্যায় সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ;
একজন বিনা এবে আর কেবা আছে—
সাঁতারিয়া প্রেম নদী পাড়ি দিতে পারে ?
ভাগ্যবান্ তুই ভবে একা সোহেলারে ।

(৩)

শিখাইতে নব রীতি—
আদর্শ পাশ্চাত্য নীতি,
শিখাইতে রাজগণে সুশাসন বিধি,
করেছেন সুপ্রচার—
হবে মহা দরবার—
মধ্য প্রদেশের শাস্তা, রাজপ্রতিনিধি । ১

যত মিত্র রাজগণ,
পেয়ে সেই নিমন্ত্রণ,
সজ্জিত সম্বলপুরে যাইতে ত্বরায় ;

* সম্বলপুরের ফিউডেটোরি রাজাদিগকে লইয়া মধ্যপ্রদেশের শাস্তা চীফ কমিসনার মধ্যে মধ্যে দরবার করিয়া থাকেন ।

সামগ্রী সম্ভার যত—
বহিয়া চলিল কত—
কাতারে কাতারে প্রজা, গণা নাহি যায়। ২

রাজার আদেশ পেয়ে,
ঘরে রেখে পত্নী মেয়ে,
স্কন্ধেতে বহিয়া ভার চলিল মাঝিয়া ;
যায় রাজ সৈন্য যত ;
অশ্ব হস্তী শত শত,
সুবর্ণ রজতময় সজ্জায় সাজিয়া। ৩

মাঝিয়া, আপন ধামে—
ক্ষুদ্র সেই কোল গ্রামে—
কাটায়েছে চিরকাল ; দেখেনি কখন
এত খানি মনোলোভা—
ঐশ্বর্য্যের দীপ্ত শোভা ;
ভাবিল "কি দুঃখী আমি, বৃথা এ জীবন !" ৪

"হস্তী শিরে, অশ্ব গলে,
যে চারু বসন ঝলে :
আমার চিমিনী মেলা কভু না পরিল ,
কাননের পশু যারা,—
আমা হতে সুখী তারা।"
ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু নয়নে ঝরিল। ৫

আসিয়া সম্বলপুরে
মাথা তার গেল ঘুরে ;
কত শত অট্টালিকা মরি কি সুন্দর !
ভাবিল সে, কিবা ছার
আপনার গ্রাম তার,
সুখহীন, শোভাহীন, ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর ।

যতন করিয়া ছাঁটা,
কচি শ্যাম তৃণ আঁটা—
অঙ্গনে দেখিল চেয়ে, সুকান্তি সুন্দর
গৌরাঙ্গ ইংরাজগণ
করিছেন বিচরণ ;
সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যকোলে শিশু মনোহর ।

পায়জামা চাপকান,
শিরে শুভ্র শিরস্ত্রান,
কোমরে রয়েছে বাঁধা বড় চাপরাস ;—
মাঝিয়ার গ্রামবাসী
মিঠা, সেই চাপরাসী ;
যার কোলে কচি শিশু । ঘুচিল তরাস

সাহসে করিয়া ভর,
'মিঠা' বলি অগ্রসর
হইল মাঝিয়া যাই, করিয়া তর্জ্জন,

দিল মিঠা তাড়াইয়া ;
হায়রে তাহার হিয়া
দারুণ বিষাদে দুঃখে হইল মগন। ৯

দূরে এক বৃক্ষমূলে
বিষাদের শ্বাস তুলে,
বসিয়া মাঝিয়া দুঃখে করিছে তুলন—
সুন্দর পোষাক পরা,
রাঙ্গা ছেলে কোলে করা,
মিঠার জীবন সহ, আপন জীবন। ১০

গ্রামেতে ফিরিতে তার
ইচ্ছা নাহি হয় আর ;
ভাবে, এই স্বর্গপুরে কেমনে রহিবে ;
মিঠার মতন তার
ভাগ্য হবে কি প্রকার ?
দুর্ব্বহ জীবন ভার কেমনে বহিবে ? ১১

নির্ব্বুদ্ধি শলভ তুমি
তেজিয়া শ্যামল ভূমি,
উজ্জ্বল হেরিয়া অগ্নি কর আলিঙ্গন ;
তেজিয়া সরল সুখ,
লভিতে উজ্জ্বল দুখ,
কেনরে দুর্ব্বুদ্ধি তোর ঘটিল এমন ? ১২

মৃত শব পড়ে যথা,
শকুনি গৃধিনী তথা—
কে জানে গো কোথা হতে—আচম্বিতে আসে
পেয়ে গন্ধ মাঝিয়ার,
কুলির সংগ্রহকার,
না জানি কি দৈব বলে এল তার পাশে। ১৩

পৃষ্ঠটি ঈষৎ নত,
নয়ন কোটর গত,
খর্ব্ব নাশ, কৃশ হস্তপদ, স্থূলোদর ;
তেলা চুলে তেড়ি কাটা,
গরমেও মোজা আঁটা,
জামাটি ছিটের, স্কন্ধে কোঁচান চাদর। ১৪

লম্বা গোপ, ছাঁটা দাড়ি,
হাতেতে পীচের বাড়ি,
ঘেঁটু গোছ ফুলবাবু চলে নানা ঠাটে ;
বাম কর পদ্ম স্থলে,
দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ তলে,
গাঁজা টিপে টিপে দাগ বসেছে তাঁবাটে। ১৫

বুকের পকেটে ঘড়ি,
গিল্টি করা চেন্ দড়ি,
আতরের তুলা কাণে, টেঁকে গোঁজা টাকা ;

পানে রাঙ্গা ভাঙ্গা দাঁত,
হেসে উঠে অকস্মাৎ—
ঈষৎ সে নত দেহ আরো করি বাঁকা। ১৬

মুদে যায় চক্ষু দুটী,
দন্ত শুধু থাকে ফুটি ;
আস্ত সেই মূর্ত্তিখানি মাঝিয়ার পাশে,
—নাড়িয়া দু' তিন বার –
শেষে বাকাইয়া ঘাড়—
ধীরে ধীরে তারে গিয়ে যতনে সম্ভাষে। ১৭

কারিগরি বিধাতার–
সাধ্য আছে বুঝিবার,
কিন্তু কুলিধরাদের অপূর্ব্ব কৌশল
নিজে বৃহস্পতি যদি
চেষ্টা পান নিরবধি—
বুঝিবারে যত্ন তাঁর হইবে বিফল। ১৮

কথা হ'ল বহুক্ষণ
কি ধনের প্রলোভন
পাইল মাঝিয়া, তাহা জানেন ঈশ্বর ;
আছে কোথা স্বর্গ রাজ্য,
যাবে যথা হ'ল ধার্য্য ;
আনিবে স্ত্রী কন্যা তাই ফিরিল সে ঘর। ১৯

(৪)

শারদ পূর্ণিমা তিথি ; গগন ভূতল
স্বচ্ছ দীপ্ত শ্যাম বর্ণে একে সুবিমল.

রজত চন্দ্রিকা তায়
ঝলমলে তার গায় ;
হেরিলে সে চারু ছবি, আপনি হৃদয়
অলক্ষিতে হয় যেন সুখ স্বপ্নময় । ১

আজি কোল গ্রামে গ্রামে
করম বোঙার নামে*
হইবে উৎসব এই চারু পূর্ণিমায়.
আনন্দ প্রবাহ সুধু বহিবে ধরায় ; ২

যতেক যুবতী মেয়ে,
বিধু মুখে সীধু খেয়ে,
বছরের শুভ দিনে সাজিয়া সুন্দর,
আনন্দে গাইয়া গান সাজাইছে ঘর । ৩

যে যাহারে ভালবাসে,
সে দাঁড়ায়ে তার পাশে,
যুবক যুবতী আজি হাতে হাত ধরি,
গাইবে নাচিবে সুখে সারা বিভাবরী । ৪

---

* বোঙা অর্থ কোল ভাষায় দেবতা। ভাদ্র মাসের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত করম দেবতার নামে উৎসব হইয়া থাকে।

সেজে তবে আয় মেলা,
কাছে আয় ও সোহেলা,
এ উৎসব ভূমে কিরে আর বিচরিবে ?
এমন সুখের নিশি আর কি ফিরিবে ? ৫

ধরি আজি হাতে হাতে
নাচ গাও একসাথে,
কঠোর দুঃখের দিনে এ স্মৃতি রহিবে ;
কে জানে জীবনে তুমি কি কষ্ট সহিবে ! ৬

কে জানে এ পূর্ণিমার
পশ্চাতে কি অন্ধকার !
কে জানে কখন নীল গগনের গায়,
উদিবে আবর্ত্তমেঘ ঘোর ঝটিকায় ! ৭

আজি এই মহোৎসবে
সুখ ভোগ কর তবে :
গাও দোঁহে সারা নিশি, নাচ ঘুরে ঘুরে ;
নির্ম্মম নিয়তি যদি গরজে অদূরে ! ৮

আজি এ পূর্ণিমা রাতি,
উজল চন্দ্রমা ভাতি ;
মাদলের তালে তালে নাচিয়া গাইয়া,
কাটাও এ চারু নিশি উৎসবে মাতিয়া ! ৯

লয়ে সিন্ধু শৈল বন—
কর সুখে আবর্ত্তন
হে ধরণি, যতদিন আছে এ জীবন ;
নিভিবে এ দীপ্ত ভানু ভেবনা এখন। ১০

---

(৫)

যাইবে সম্বলপুর, সুখ স্বপ্নে ভরপুর—
কত ধন, কত রত্ন, লভিবে মাঝিয়া।
ঘুচিবে শ্রমের দুখ, স্ত্রী কন্যার হবে সুখ,
বসন ভূষণে সবে রহিবে সাজিয়া।

প্রলুব্ধ অন্তরে তার, সেই চিন্তা অনিবার ;
মনে মনে সুখ স্বর্গ সুন্দর রচিল।
লাঙ্গল বলদ ঘর, বেচিল সে অতঃপর,
ক্ষেত্র শস্য যাহা ছিল সকলি বেচিল।

সেই চির সুখধাম---আপনার ক্ষুদ্র গ্রাম,
তেজিয়া যাইতে ক্লেশ নাহি মাঝিয়ার
কিন্তু মেলা ফিরে চায়, বুক তার ফেটে যায় ;
সে যে রত্ন ফেলে যায় তাহার হিয়ার।

চলেছে সম্বলপুরে, সোহেলা দাঁড়ায়ে দূরে--
প্রাণ তার ঘুরে ফিরে যায় তার কাছে ;
"কি হইবে রত্নে ধনে" ? ভাবে মেলা মনে মনে ;
সোহেলা ছাড়িয়া তার কিবা ধন আছে ?

চোখে চোখে সুধু চেয়ে, চলিল দুঃখিনী মেয়ে ;
বিষাদে সোহেলা হেথা হেরে অন্ধকার।
প্রকৃতির রম্য ক্ষেত্রে দাঁড়ায়ে সজল নেত্রে
ভাবে কবি, এ জীবন এত কি অসার ?

বর্ণিয়া কি হবে আর তার পরে মাঝিয়ার
হ'ল যাহা, ধূর্ত্ত নর-পশুর ছলনে ;
তেজি গৃহ তেজি সুখ, ভুঞ্জিতে অনন্ত দুখ,
চলিল হইয়া কুলি ভুলি প্রলোভনে !

সোহেলারে ভাবি মনে, কাঁদে মেলা সংগোপনে ;
ভাবিছেঃ—বিধাতা একি পড়িনু সঙ্কটে ?
একা সুধু—সুখ আশে, মাঝিয়া আনন্দে ভাসে !
কি দণ্ডে বিধাতা তুমি দণ্ডিবে গো শঠে ?

---

(৬)

যায় দিন মাস যায়, কাঁদাইয়া সোহেলায় ;
জানেনা সে হতভাগ্য কোথা তার মেলা ;
শুষ্ক সে জীবন ভার, পারে না বহিতে আর ;
লোকস্রোতে নিত্য ভাবে রয়েছে একেলা।

চিত্তবিনোদন তরে, কত কি প্রয়াস করে,
কিন্তু মেলাময় প্রাণ কিছুতে না বসে ;
নিত্য ভাবে কোথা যাব, কোথায় সন্ধান পাব,
কাটে দিবা কাটে নিশি দারুণ বিবশে।

শেষে স্থির হ'ল তার, ছাড়ি গ্রাম পরিবার,
খুঁজিবে পৃথিবীময় পর্ব্বতে কাননে ;
কাঁদিয়া ধরিলে পায়, অবশ্য কেহ না তায়
বলিবে, কোথায় গেলে পাবে তার ধনে।

গলি গলি ঘুরে ঘুরে খুঁজিল সম্বলপুরে ;
কেহ না বলিল তারে কোথা মেলা হায় !
নিরাশায় অবশেষে, পথ বেয়ে অন্য দেশে
চলিল খুঁজিতে তার প্রাণ প্রতিমায়।

অর্দ্ধাহারে অনিদ্রায়, নিরন্তর ভাবনায়,
শীর্ণ তনু, জীর্ণ প্রাণ, চলিতে না পারে।
একদা মধ্যাহ্ন বেলা—বিষাদে বসে সোহেলা
শ্রান্ত দেহে বৃক্ষমূলে রাজপথ ধারে।

রবিতপ্ত বৃক্ষছায়, শেষে শুয়ে নিদ্রা যায় ;
কে জিজ্ঞাসে কেন বা সে পড়িয়া একেলা
বুকেতে চাপিয়া তার, চিন্তারাশি আপনার,
লভিতে ক্ষণিক তৃপ্তি, ঘুমায় সোহেলা।

এক(ই) চিন্তা প্রাণ যার, করিয়াছে অধিকার,
জাগ্রতে নিদ্রায় তার প্রভেদ কোথায় ?
হেরিল সে স্বপ্নাবেশে কোথা কোন দূর দেশে
যাইয়া পেয়েছে যেন তাহার মেলায় ।
আনন্দে যেমন তারে, গেল বুকে ধরিবারে,
শূন্যে মিলাইয়া যেন গেল মেলা তার ;
অকথ্য বিষাদে দুখে, শূন্য বাহু চাপি বুকে,
যাতনায় করিবারে চাহিল চীৎকার ;
কিন্তু কি পাষাণ ভার, বুকেতে বাধিল তার,
ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ নাহি ফোটে কথা ।
দৈব যোগে সেইক্ষণ, কোন যুবা দুইজন
হেরিল গোঙাতে তারে বৃক্ষতলে তথা ।
দুঁহে তার বসি পাশে, জিজ্ঞাসে সদয় ভাষে,
দুঃস্বপ্ন পীড়িত নিদ্রা ধীরে ভাঙ্গাইয়াঃ—
কিবা নাম কোথা বাস, কোথা যেতে অভিলাষ,
আশ্রয় আহার পাবে কত দূরে গিয়া ।
এমন করিয়া তার, দুঃখে দুঃখী হয়ে আর
কেহ ত সুধায় নাই অভাগার কথা ।
দুঃখময় তার চিত, এ জগতে উপেক্ষিত ;
কেহ ত জিজ্ঞাসে নাই বিষাদ বারতা !
বসি সেই বৃক্ষমূলে, ক্ষণেক নিরাশা ভুলে,
যাতনার কথা তার কহিল সোহেলা ।

শুনিয়া চিন্তিত মনে, কহে তারা দুইজনে—
"চল আমাদের গ্রামে, অপরাহ্ণ বেলা ;
আজি নিশি অন্ধকার, তাহে গ্রাম নাহি আর ;
সুধুই পাহাড় বন সপ্তক্রোশ ব্যাপি'।"
কহে তারে ধরি করে—শ্রান্তি বিনোদন তরে
যাও আজি এই গ্রামে নিশিখানি যাপি'।'

সেই কোল যুবা দুইজন,
আহার বিশ্রাম দিয়ে . সোহেলারে সান্ত্বনিয়ে,
করে সবে কথোপকথন। ১
কহে তারা, শুনিছে সোহেলা—
"অর্থ উপার্জ্জন তরে, ছিনু মোরা বরাকরে—
বঙ্গদেশে, রাণীগঞ্জ জেলা। ২
"তথায় বাঙ্গালী একজন,
আসামেতে কুলি করে, পাঠায় মানুষ ধরে,
দেখাইয়া অর্থ প্রলোভন। ৩
"কিছুদিন পূর্ব্বে তিনজন,
তাহার চক্রেতে পড়ি, পেয়ে কিছু টাকাকড়ি
করিয়াছে আসামে গমন। ৪

"কি জানি, তারাই যদি হয়—
যাহাদের তরে তুমি, ভ্রমিতেছ সারা ভূমি ;
মুণ্ডা তারা * জানি তা নিশ্চয় ।৫
"সেও গেছে স্ত্রী কন্যা লইয়া ।
বামণ্ডা তাহার ঘর, শুনেছিনু পরস্পর ;
নাম বুঝি শুনিছি মাঝিয়া ।" ৬
চমকিয়া উঠিল সোহেলা ।
বিদ্যুৎ ছুটিল দেহে, তিষ্ঠিতে না পারে গেহে ;
যেতে চায় নিশীথে একেলা । ৭
"মাঝিয়া" ? "মাঝিয়া তার নাম ।"
আর কি সন্দেহ থাকে ? কে তারে ধরিয়া রাখে ?
ইচ্ছা, যাবে মুণ্ডে আসাম । ৮
সারা নিশি ছট্‌ফট্ করে ।
পাগলের মত কত, সুধাইল অবিরত,
কাতরে দোঁহার হাত ধরে ।৯
"ক'দিনের পথ সে আসাম ?"
"বহু দূর দেশ সেই, তার পর পৃথ্বী নেই,
"তার পর দেবতার ধাম । ১০
"আমরা ত জানিনা সন্ধান ।
তুমি বরাকরে, জানিতে পারিবে পরে ।"
উঠে পড়ে সোহেলার প্রাণ । ১১

---

* কোলদিগের শ্রেণীবিশেষ ।

উৎকণ্ঠায় নিশি কেটে যায়।
কহি দোঁহে বহুবার, লভিল সে উপকার,
প্রভাতে সে লইল বিদায়। ১২

কিছুদিনে গেল বরাকরে ;
কিন্তু সেই দূর পথে, আসামেতে কোনমতে,
একাকী সে যাইবে কি করে ? ১৩

শেষে যুক্তি স্থির হল তার—
অল্পদিনে বিনা ব্যয়ে যাবে তথা কুলি হয়ে ;
দরশন পাইবে মেলার। ১৪

মূর্খ তুমি, জান না সোহেলা,
বিস্তীর্ণ আসাম ভূমি, কোথা তার যাবে তুমি ?
কোথা বা রয়েছে তব মেলা ? ১৫

আসাম।

(৮)

কল্পনার নিদ্রা, চারু স্বপ্ন দুরাশার,
একেবারে গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ;
সামালীর চা বাগানে * কোথায় তাহার
স্বর্ণ রাজ্য কাঁদিছে মাঝিয়া !

স্থান ও লোকগুলির প্রকৃত নাম আইনের ভয়ে গোপন করা গেল

স্বাধীন জীবন তার, সুখের ভবন,

সেই রম্য মুণ্ডাবীরা গ্রাম ;

দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী প্রতিবেশিগণ

কোথা আজি ? ভাবে অবিরাম।

যবে কেহ দূর হ'তে করে দরশন,

মনে হয়—দূর দূরান্তরে

সুনীল তরঙ্গগুলি সাগরে কেমন

চির স্থির আছে পরে পরে ;

তেমনি, যে শৈলমালা শোভিত সুন্দর,—

যবে গিয়ে বড়রমা শিরে *

দাঁড়ায়ে, দেখিত চেয়ে। আজি সাধ করে

একবার দেখিবারে ফিরে।

যৌবনে, যে শৈলোপরি বসিয়া চিমিনী,

আগ্রহে শুনিত তার মুখে,

গেরোয়া রাজার সেই অপূর্ব্ব কাহিনী ; †

স্মরি আজি বুক ফাটে দুখে।

মেলারে লইয়া কোলে, দাঁড়ায়ে তথায়,

শিখাইত "বুরু" ‡ "বীর" ॥ নাম—

* বড়রমা—বামডার পর্ব্বত বিশেষ।

† কোলভাষায় গেরোয়া অর্থ চড়াই পাখী। গেরোয়া, গেরোয়াইন্, রাজা ও রাণী বলিয়া সম্মানিত ; এবং কোলেরা এ পাখীর মাংস খায় না। রাজা রাণীর উপন্যাস বহু বিস্তৃত।

‡ বুরু—পাহাড় ॥ বীর—বন।

পদতলে শ্যাম ক্ষেত্রে শোভিত যথায়—
সাধের সে মুণ্ডাবীরা গ্রাম।
একেলা ছুটিয়া মেলা পাহাড়ে উঠিত,
ভুলাইয়া আনিত মাঝিয়া;
'কুলা' * ডাকে 'তুয়ূ' + ডাকে বলিয়া শঙ্কিত
করিয়া সে বালিকার হিয়া।
হায় সে সুখের পুরী সেই স্বর্গধাম,
ফিরিয়া কি পাইবে আবার
ইচ্ছা সুধু, মৃত্যুকালে শেষের বিশ্রাম
করিবে সে চরণে শিলার
কি কঠোর দাস্যবৃত্তি! এ হ'তে মরণ
শতগুণে শ্রেষ্ঠ মানে মনে।
ধূর্ত্তের ছলনা আজি করিয়া স্মরণ
মাঝিয়া কাঁদিছে নিরজনে।
মরমে দারুণ জ্বালা, তবুও চিমিনী
পতি আর কন্যার সেবায়,
লুকায়ে অনল বুকে সে হতভাগিনী
পুড়ে মরে প্রচ্ছন্ন শিখায়।
আর সে সরলা মেয়ে? আহারে মেলার
ফুল্ল মুখে বিষাদের দাগ!

* কুলা—বাঘ। + তুয়ূ—শৃগাল।

দারুণ বিচ্ছেদ আসি গ্রাসিল যে তার
প্রণয়ের নব পূর্ব্ব-রাগ ;
এখনো নয়নে তার জ্যোতি খেলা করে,
এখনো ক্বচিৎ ফোটে হাসি ,
কিন্তু মনে হয় যেন আঁধার অম্বরে
ক্ষণপ্রভা দেখা দেয় আসি ।
"কোথায় সোহেলা মোর" ? ভাবে মেলা মনে—
এ জীবনে আর না হেরিব ;
দুঃখেতে যাপিয়া দিন আসামের বনে
দুঃখ নিয়ে একেলা মরিব !"
মা বাপ ভাবিল মনে—"নবীন যৌবনে
মেলা কেন রহিবে বিষাদে ?
"এখানেও মুণ্ডা আছে ; কোন যুবা জনে
দিব তারে রহিবে আহ্লাদে ।"
মেলারে করিতে সুখী, আনি যুবা কত
নিত্য নিত্য তাহারে দেখায় ;
কিন্তু মেলা বিবাহেতে হ'ল না সম্মত ;
ভাবে তারা; ঘটিল কি দায় ।
চিমিনী বুঝিয়া ভাবে কহে মাঝিয়ারে—
"বৃথা আশা মেয়ে সুখী হবে ,
"কোথায় উদ্ধার ? এই দুঃখের পাথারে
আসি মোরা পড়িয়াছি যবে ?

"সুখ, আশা,—আমাদের—জন্মের মতন—
ফেলিয়া এসেছি মোরা যথা,
জীবনের আশা তার, প্রাণের রতন,
বুঝি মেলা ফেলে এল তথা।"
এইরূপে কাটে দিন; এমন সময়
ভাগ্যচক্র নব দুঃখ আনে ;
এ জগতে হে বিধাতা তুমি দয়াময়,
তবু নর দগ্ধ অগ্নিবাণে !
বাগানের কাজ সারি, আপনার ঘরে
একদিন যায় মেলা ফিরে ;
পথে তার জেম্‌সন্ প্রফুল্ল অন্তরে
বেড়াইছে হাওয়া খেয়ে ধীরে।
ছোট ছোট গাছগুলি পীড়িছে চাবুকে,
শিষ দিয়ে ডাকিছে কুকুর ;
কভু মৃদু মৃদু গান বাহিরিছে মুখে,
মত্ত গন্ধ যথায় প্রচুর।
যায় মেলা, জেম্‌সন্ দেখিল চাহিয়া ;
পাপ চিত্ত হইল চঞ্চল ;
"এ বাগানে আমি প্রভু" মনেতে ভাবিয়া,
আগুসারি ধরিল অঞ্চল।
আতঙ্কে চীৎকার করি বস্ত্র ছিনাইয়া—
ছুটিয়া পালাল মেলা ঘরে ;

এদিকেতে জেম্‌সন্‌ হাসিয়া হাসিয়া—
মনে মনে এই চিন্তা করে—
"সকলের প্রভু আমি, আমারে হেরিয়া
অবশ্য সঙ্কোচ হতে পারে;
"তাহে এ বালিকা অতি; কেমন করিয়া
নির্ভয়ে আসিবে একেবারে?"
এখনি পাঠাব চর, বুঝায়ে কহিবে,
আমি তারে করিব আদর;
এ বাগানে অল্প শ্রমে আনন্দে রহিবে,
পাবে অর্থ বসন সুন্দর।"
তার পর বহুবার পাঠাইয়ে চর—
মনোরথ যবে না পূরিল,
ক্রোধে ক্ষোভে পরিপূর্ণ হইল অন্তর;
কিছুতেই বুঝিতে নারিল—
সুন্দর গৌরাঙ্গ তিনি, সুসভ্য ধরায়,
অতি নীচ কুলি সে রমণী,
তাহার এ "অনুগ্রহ" কেন নাহি চায়?
পশু জাতি মূর্খ কি এমনি?
"বোধ হয় শঙ্কা আছে এখনো অন্তরে:
নিঃশঙ্ক করিব আমি তায়;
আমি 'মৃদু' 'দয়াপূর্ণ' বুঝাব বর্ব্বরে,
অর্থ দিব তার বাপ মায়।

(৯

খ্রীষ্টের জনম তিথি ; আজি বড় দিন ।
মহোৎসব খ্রীষ্টান মহলে ;
সীমালির জেম্‌সন্ বড়ই সৌখীন,
খ্যাত কথা শ্বেতাঙ্গের দলে।
পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত বাগান ভবন,
খাদ্য মদ্য এসেছে প্রচুর ,
নিমন্ত্রিত "হৃদয়ের বন্ধু" একজন,
অবস্থান নহে বহুদূর ।
মেরাটি বাগানে তিনি প্রভু বা ঈশ্বর,
নাম তাঁর জোহন্ নেলার .
পেয়ে শুভ নিমন্ত্রণ আসিল সত্বর,
"খ্রীষ্টরক্তে" বাড়ায়ে "ভেলার ।
সঙ্গে তাঁর আসিয়াছে কুলি চারিজন,
অশ্ব কুক্কুরের সেবা তরে ;
প্রভুগুলি বাধি তারা করিছে ভ্রমণ
যথা সব কুলি বাস করে ।
শ্রম হতে অবকাশ পেয়ে কুলি যত,
আনন্দেতে হয়েছে মগন ;
কিন্তু চিন্তাগ্রস্ত প্রাণে চিন্তা উঠে কত,
কর্ম্মশূন্য হয় যবে মন ।
বিষাদে মলিনমুখী বিষাদিনী মেলা

একাকিনী বাহিরে বসিয়া,
ভাবিছে, কোথায় তার প্রাণের সোহেলা,
নয়নের জলেতে ভাসিয়া।
হেন কালে, অহো বিধি! একিরে সম্ভবে?
চীৎকার করিয়া উঠে মেলা,
চিমিনী মাঝিরা দ্রুত বাহিরিয়া সবে,
দেখে, দ্বারে দাঁড়ায়ে সোহেলা।
মেলারে সাপটি বুকে করিছে রোদন,
কাঁপে মেলা সংজ্ঞা হারাইয়া,
সকলে বসায়ে দোঁহে করিল যতন,
কাঁদে মেলা চেতনা পাইয়া।
বুঝিল মা বাপ আজি, কি রত্ন ফেলিয়া
এসেছিল অভাগিনী মেলা,
যার তরে—দেশ ভুঁই চরণে ঠেলিয়া—
আসিয়াছে একেলা সোহেলা।
কত কথা পরস্পরে কত অশ্রুজল,
লেখনী তা কেমনে বাখানে?
ক্ষমা কর হে পাঠক, কল্পনার বল
পরাজিত হ'ল এই স্থানে।

*　　　*　　　*

এদিকে উৎসব রঙ্গ ডিনারের ধুম,
শশব্যস্ত খানসামাগণ;

হুকুমের পরে হয় নূতন হুকুম,
প্লেটের গ্লাসের ঝন্‌ঝন্‌।
একে চিত্ত পশু সম, তাহে মদিরায়
অভিষিক্ত ভাসে সুখ নীরে ·
ডেকে কহে জেম্‌সন্‌, "কে আছ, ত্বরায়
আন সেই কুলি রমণীরে।
আদেশে ছুটিল দূত ; মাঝিয়ার ঘরে,
ছিল মেলা সোহেলার পাশে ;
কহে দূতঃ—"উঠ মেলা চলগো সত্বরে
যেতে হবে সাহেবের বাসে।"
আতঙ্কে তখন মেলা করিয়া চীৎকার
জড়ায়ে ধরিল সোহেলায়।
চিমিনী মাঝিয়া আসি করে হাহাকার,
ভাবে, "বিধি, একি হল দায় !"
শুনেছিল সোহেলা সে পাশব কাহিনী,
গর্জ্জিয়া উঠিল ক্রোধভরে ;
কহিল—স্পর্শিবে যদি আমার কামিনী,
পাঠাইব জেনো যম ঘরে।"
কোলাহলে সাহেবের ভৃত্য দুইজন
আসি তথা হল উপনীত ;
লভি বল, দূত তবে করিল তর্জ্জন ;
বলে, "শাস্তি দিব সমুচিত।"

তিনজন একদিকে ; মাঝিয়া সোহেলা
অন্য দিকে ; তুরন্ত যুঝিল।
কি তেজ কুলির প্রাণে, সাহেবের চেলা
তিনজন, বিশেষ বুঝিল।
কিন্তু অবশেষে তারা পরাজি ছু'জনে
বালিকারে ছিনায়ে লইল।
কাঁদে মেলা, কাঁদে মাতা, সে আর্ত্ত রোদনে
শীত নিশি কাঁপিতে লাগিল।
কিঞ্চিৎ লভিয়া বল, কুপিত অন্তরে
বাহিরিল মাঝিয়া সোহেলা ,
ততক্ষণে দূতগণ সাহেবের ঘরে
সব কথা করিল এত্তেলা :
"কাল্ তার হবে সাজা" বলিয়া তখন,
সান্ত্বনিতে কুলি বালিকায়,
তইয়া তৎপর অতি সাহেব ছু'জন,
টেনে তারে চেয়ারে বসায়।
মেলার চীৎকার রবে পূরিল ভবন,
পিশাচ, তা কিছু না গণিল ;
উঠিতে প্রয়াসে বালা ; কিন্তু তুইজন
জোর করি ধরিয়া রাখিল !
হেনকালে আসি সেথা কবাট খুলিয়া
সোহেলা ঢুকিল বাঙ্গলায় ;

"রোখো রোখো" কহে ভৃত্য, "নেকালো" বলিয়া
হাঁকে "বীর" শ্বেতাঙ্গ তথায় ;
ভৃত্যদের কশাঘাতে বাহিরে নাঝিয়া
ভূতলেতে কাঁদিয়া লুটায় ;
এদিকে চাবুক ধরি, নেলার গর্জ্জিয়া
সোহেলারে পিটিয়া তাড়ায়
চীৎকার করিছে দোঁহে বাহিরেতে পড়ি,
চিমিনীও আসিয়া জুটিল।
খ্রীষ্টের জনম্‌তিথি পুণ্য বিভাবরী
সীমালিতে এরূপে কাটিল।
সরল পরাণ যার, নিষ্পাপ হৃদয়,
এ নরক কেন ভাগ্যে তার ·
বুঝিতে অক্ষম চিত্ত, ওহে দয়াময়,
তব রাজ্যে একি ব্যবহার।

— * —

(১০)

জোহন্ নেলার আর ফ্রেড্ জেম্‌সন্
অভিযুক্ত আজি আদালতে ·
পাপীর দণ্ডের তরে ধর্ম্মাধিকরণ
একমাত্র ভরসা জগতে।
ধর্ম্মমঞ্চে হুইলার ধর্ম্ম অবতার
পার্শ্বে বসি আসামী দু'জন

কি হবে, ভাবিয়া প্রাণ কাঁপিছে মেলার ;
মুখে তার সরে না বচন ।
ডাকিয়া হাকিম তারে জিজ্ঞাসেন কথা,
ভয়ে তার পরাণ শুকায় ;
সাহসে করিয়া ভর নাহি পারে তথা
কহিতে, যা' কহিবারে চায় ।
সহজে হইল স্থির :- 'মিথ্যা অভিযোগ'
'মিথ্যাসাক্ষী, মিথ্যা সমুদয়'
করিয়াছে ষড়যন্ত্র 'বদমাস্ লোগ্' ;
আসামীরা পাইল বিদায় ।
আসামী নিস্কৃতি পেলে ; কিন্তু তার পর
মিথ্যা সাক্ষীদান অপরাধে,
পাষণ্ড ইংরাজকুলে সেই ডুইলার
দুঃখীজনে নিঃক্ষেপিল ফাঁদে !
বাকিয়া টিমিনী আর সোহেলা এবার
জেলে যাবে হুকুম হইল ।
হায় অনাথিনী মেলা ! কি হবে তাহার ?
ধরি তারে বাগানে লইল ।
হায় হায় করি জেলে কাঁদে তিনজন ;
বাগানে একেলা কাঁদে বালা ;
কিছুদিনে বালিকার ফুরাল জীবন ;
ফুরাল এ জীবনের জ্বালা ।
(১৮৯০)

বিন্ধ্যবাসিনী

পূর্ব্বভাগ।

(১)

আর্য্যের নিবাস ক্ষেত্র বেষ্টিয়া যখন
অনার্য্য করিত বাস পর্ব্বতে কাননে,
লুণ্ঠিত সুযোগ দেখি আর্য্যের ভবন,
নিত্য সশঙ্কিত করি ঋষি তপোধনে ;

(২)

সেই কালে, পঞ্চনদ-ধৌত পুণ্যস্থল—
ব্রহ্মাবর্ত্ত জনপদ, পূরি আর্য্যবাসে,
গঙ্গার প্রবাহ ধরি, পূরব অঞ্চল
হেরিয়া উর্ব্বর অতি, আর্য্য স্রোত আসে

(৩)

শুভ্রতোয়া সরস্বতী, নীলাম্বু যমুনা,
উচ্ছ্বসিত গঙ্গাবক্ষে নীরবে যথায়
মিশিয়া পাইল আখ্যা ত্রিবেণী, ত্রিগুণা,
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি সম মিশি ত্রিধারায়,

(৪)

সেই পুণ্য তটভূমে আর্য্য ঋষিগণ,
রচিলা কুটীর আসি তপস্যার তরে ;
পত্নীসহ নিত্য তথা যত তপোধন
উদাত্তাদি*স্বরত্রয়ে বেদ গান করে।

(৫)

যজ্ঞ, বলি, তপস্যায়, কিম্বা বেদগানে,
রমণীর অধিকার অক্ষুণ্ণ তখন ;
প্রভাতে সায়াহ্নে তারা নিত্য সোমপানে
পুরুষের মত হ'ত সমাধি মগন।

(৬)

একদিন সন্ধ্যাকালে ঋষি পত্নীগণ,
একত্রে মিলিয়া সবে সাম গান করে ;
বামা-কণ্ঠ-পুণ্যগীতি বহিয়া পবন
উড়িছে আনন্দে সেই সায়াহ্ন অম্বরে।

(৭)

ত্রিস্বরে* মিলিয়া গীতি ত্রিবেণীর মত,
সে চারু তপস্যা ক্ষেত্র পরিপ্লুত করে ;
ভাবে, ভাবমগ্ন নিত্য স্বামী ঋষি যত—
'কাহার প্রবাহ সমধিক তাপ হরে ?'

* *

* উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত।

(৮)

সহসা থামিল গীত অর্দ্ধ উচ্চারিত,
সহসা রমণী কণ্ঠে চীৎকারের ধ্বনি ;
কুটীরে যতেক ঋষি ত্রাসে চমকিত,
কি হইল বলি সবে ছুটিল অমনি।

(৯)

যে যাহার সংগ্রহিনে আত্ম ধনুর্ব্বাণ,
সাম গৃহ লক্ষ্য করি হল আগুসার ;
কিন্তু হেরি শূন্য গৃহ স্তম্ভিত পরাণ !
(দূরে দূরে শোনা যায় সরিছে চীৎকার।)

(১০)

দূর হতে শোনা যায় নৈশ স্তব্ধতায়,
"দস্যুহস্ত হতে আজি রক্ষা কর আসি"
উন্মত্ত হইয়া সবে বেগে ক্রোধে ধায় :
কোথা পথ ? অন্ধকার আছে বিশ্ব গ্রাসি !

(১১)

দারুণ ক্রোধের দাহে জ্বলিছে পরাণ,
সহস্র বৃশ্চিক যেন দংশে নিরন্তর !
প্রতিজ্ঞা, যেমনে হোক্ করিবে সন্ধান :
দিশেহারা, সংজ্ঞাহারা হয় অগ্রসর।

(১২)

কণ্টক আকীর্ণ পথ, বিষম বন্ধুর ;
বিশাল অরণ্য তাহে ব্যাপি' পুরোভাগে ;
কিছু নাহি গণি চিতে, যায় যতদূর
কাতর ক্রন্দন ধ্বনি যায় আগে আগে ।

(১৩)

দুর্গম সে বনভূমি ; কোথা যাবে আর ?
ক্রমে মিলাইয়া গেল রোদনের ধ্বনি !
ক্রোধে, ক্ষোভে, নিরুপায়ে, ছাড়িল হুঙ্কার ;
লৌহের পিঞ্জরে যথা গর্জ্জে কালফণী ।

(১৪)

সহসা নিশীথে একি বিপদ পড়িল,
ভাবি, বিধুনিয়া পক্ষ, ছাড়িয়া কুলায়,
তরাশে চমকি শত বিহগ উড়িল :
মর্ম্মরি কানন, ভয়ে বনপশু ধায় ।

(১৫)

কিছুক্ষণে আর বার নিঃশব্দ ধরণী ;
নিঃশব্দ কানন ; স্তব্ধ ঋষিকণ্ঠস্বর ;
যদিও বহিয়া বেগে মস্তিষ্ক, ধমনী,
চিন্তা, আর—রক্তস্রোত, ছোটে তীব্রতর ।

(১৬)

সকরুণ তীব্রস্বরে ঋষি গ্রামপতি—
কিছুক্ষণে কহিলেন সম্ভাষিয়া সবে :—
"চিন্তহ উপায় উদ্ধারিতে আর্য্য সতী,
নিশীথে অরণ্যে রহি কিবা ফল হবে ?

(১৭)

"অনার্য্য দস্যুর দল আসি আর্য্য ধামে,
নরহত্যা, পশুহত্যা, শস্যাদি হরণ
কত যে করিছে নিত্য ; কিন্তু আর্য্য গ্রামে
এ হেন বিপৎ-পাৎ হয়নি কখন ।

(১৮)

"ভীরু কাপুরুষ সেই কৃষ্ণ দস্যুদল
জানে না সম্মুখ যুদ্ধ কিম্বা সন্ধি নীতি ;
কেমনে বা বল তবে বর্ব্বর কবল
হইতে উদ্ধারি নারী, এই মনে ভীতি ।

(১৯)

"কেন উদ্ধে দেবগণ উন্মীলি নয়ন
নেহারি এ অত্যাচার এত উদাসীন ?
নিত্যপূজি নব পুষ্প করিয়া চয়ন,
তবুও কি অপরাধে এদশা মলিন ?

(২০)

"দেবতা আর্য্যের বল, আর কেহ নাই ;
বিপদ্ খণ্ডিবে তাঁর পূজিলে চরণ :
কি হবে হেথায় তবে ? চল গৃহে যাই ;
যদিও রমণী শূন্য শ্মশান ভবন।

(২১)

"চল যাই, ঘৃত কাষ্ঠ, আহরি যতনে,
ত্রিধারা সঙ্গমে করি যজ্ঞ আয়োজন ;
তপ্ত সিকতায় বসি থাকি অনশনে :
দেখি তুষ্ট হয় তাহে যদি দেবগণ।"

(২২)

দলপতি, গ্রামপতি, তাঁহার আদেশে
কি আছে করিতে যাহা ক্ষুণ্ণ হবে কেহ ?
শিরোধার্য্য করি কথা, ফেরে অবশেষে
বিষাদ মলিন মনে সুখহীন গেহ।

(২৩)

না রঞ্জিতে পূর্ব্বাকাশ উষার প্রভায়,
না ডুবিতে দীপ্তি গর্ব্বে তারকা উজ্জ্বল,
সমবেত যত ঋষি স্তব্ধ তমিস্রায়,
ত্রিবেণী সৈকত ভূমে—বিষাদ-বিহ্বল।

(১৪)

স্নান করি শুদ্ধ নীরে, কুশ কাষ্ঠ আনি,
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ ভক্তিপূর্ণ মনে .
উচ্চারিলা মন্ত্রপূত দিব্য বেদবাণী,
হোত্র ধূম সহ স্তোত্র উঠিল গগনে .

(১৫)

গেল নিশা, গেল উষা, প্রভাত অতীত .
ঊর্দ্ধে বর্ষে দীপ্ত বহ্নি মধ্যাহ্ন তপন ;
সুতপ্ত বালুকা ভূমে যজ্ঞ প্রজ্জলিত ;
ত্রিবহ্নি ত্রিবেণীকূলে জ্বলিছে কেমন !

* * *

(১৬)

ত্রিবেণীর পরপারে সহসা হেরিলা
চকিত বিস্মিত নেত্রে যত ঋষিগণ,
(যজ্ঞ পুণ্যফল যেন বিধি প্রদানিলা)
দ্রুতা তপস্বিনীগণ করে আগমন ।

(১৭)

এত নহে দৃষ্টি ভ্রান্তি, ওই সারি সারি
ভগ্নকণ্ঠে উচ্চারিয়া পূত বেদগান,
ঋষির নয়নানন্দ আসে যত নারী ;
আচম্বিতে মৃতদেহে সঞ্চারি পরাণ ।

(২৮)

জানু পরশিয়া ভূমে, যুড়ি দুই কর,
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গায় দেবতার জয় ;
বাষ্পরুদ্ধ নেত্রে হেরি ঊর্দ্ধে দিবাকর,
বরণীয় জ্যোতি তাঁর ধ্যায় ঋষিচয়।

(২৯)

উতরি সঙ্গমবারি, ঋষি পত্নীগণ
হোমাগ্নি বেষ্টিয়া সবে, নমি দেবতায়,
ভক্তিভরে বন্দি গ্রামপতির চরণ,
অধোমুখে বসে সবে তপ্ত সিকতায়।

(৩০)

বসিলা নিস্তব্ধে সবে সজল নয়নে ;
কুশহস্তে গ্রামপতি দাঁড়ায়ে তথায়
সম্ভাষিয়া আর্য্য নারী গম্ভীর বচনে,
বিষাদ বারতা যত জিজ্ঞাসে সবায়।

(৩১)

"দেবপ্রাণ আর্য্যসতী, কহ কি কৌশলে
কৃষ্ণদস্যু হস্ত হ'তে পাইলে উদ্ধার ?
দেখিতেছি ফিরে তো গো আসিলে সকলে,
কিন্তু কোথা পুত্রবধূ রহিল আমার ?

(৩২)

"গৃহের আলোক, মম নয়নের তারা,
সংসার যজ্ঞের সেই দীপ্ত পুণ্যফল,
কোথা সে রহিল বল, একা, সঙ্গহারা ?
কহ তার ঘটিয়াছে কিবা অমঙ্গল।"

(৩৩)

ভাসিয়া নয়ন জলে, করে কর চাপি,
কহিলা করুণ কণ্ঠে ধর্ম্মপত্নী তাঁর,
কহিতে না পারে যেন ওঠে বক্ষ কাঁপি,
রুদ্ধ কণ্ঠ রুদ্ধ আঁখি বাষ্পে অনিবার।

(৩৪)

"কোথা সে জানি না পথ; নৈশ অন্ধকারে
বহিয়া লইয়া সবে দস্যুপল্লী মাঝে
পূরি গ্রাম ক্রূর হর্ষে পাশব চীৎকারে—
হোল উপস্থিত যথা দস্যুপতি রাজে।

(৩৫)

"আশীষিয়া দস্যুদলে, বর্ত্তিকা লইয়া
একে একে হেরিলা সে আনন সবার,
লাজে ভয়ে সংজ্ঞা যেন এল মিলাইয়া;
উদ্দেশে দেবের পদে যাচিনু উদ্ধার!

(৩৬)

"বিস্ময় হইল বড় যবে সে বর্ব্বর,
ঋষিবর-পত্নী বলি সম্ভাষিলা মোরে,
কিরূপে চিনিল সবে জানেন ঈশ্বর ;
সন্ধান কত না জানি রাখে দুষ্ট চোরে।"

(৩৭)

"কহিলা সে ; —ঋষিপত্নী, বাসনা আমার,
ছিল শুধু তব পুত্রবধূ হরিবারে,
কিন্তু অনুচরগণ চিনিতে তাহায়
পারিবে না ; তাই হেথা এনেছে সবারে

(৩৮)

"শুনিয়া বিষণ্ণ প্রাণে জ্বলিল অনল,
কি করিব সাধ্য নাই যুঝি তার সনে ,
তবু যেন মৃতদেহ হইল সবল,
উঠিনু বাধিতে বৃথা, বর্ব্বর সে জনে।

(৩৯)

"তুচ্ছ করি সে বিক্রম নিরস্ত্র নারীর
কহিল ;—'বিদায় তুমি পাইবে অচিরে ;
স্পর্শিব না তব পুত্রবধূর শরীর,
যদিও রহিবে একা আমার মন্দিরে।

(৪০)

"লয়ে যাও এই বার্ত্তা ;—কৃষ্ণ দস্যুপতি
ফিরাইয়া দিতে পারে বন্দিনী রমণী,
বনভূমি আত্মসাৎ নাহি কর যদি,
শত গাভী শত অশ্ব দিবে যদি গণি ,

(৪১)

"সঙ্গে লয়ে একশত আর্য্য ধনুর্ব্বাণ,
সঙ্গে লয়ে বিংশখানি আর্য্য তরুবারি,
আসিবে একাকী গ্রামপতির সন্তান,
বর্ষ মধ্যে এই স্থানে। নতুবা এ নারী

(৪২)

"হবে মম সেবা দাসী। পথের সন্ধান
দিব না তোমায় ; এই মম অনুচর
রাখি যথা তোমা সবে করিবে প্রয়াণ
সেই স্থান হতে লক্ষ্যে আসিবে নগর।

(৪৩)

"সেই স্থানে পুত্র তব একাকী যখন
আসিবে ; দেখাতে পথ রবে মম চর ;
সত্যপ্রিয় জাতি মোরা করি না কখন
ছলনা আর্য্যের মত ; যদিও বর্ব্বর।

(৪৪)

"এত বলি চরসঙ্গে করিল বিদায়,
নিবিড় সে বনপথে আসিনু আঁধারে ;
অবশেষে উপনীত হইনু যথায়
হেরিনু আর্য্যের গঙ্গা বহে মন্দধারে।

(৪৫)

"বিষাদ বিহ্বল চিতে নদী তীর ধরি
আসিলাম অবশেষে কহিতে সন্দেশ ;
যা হয় বিহিত কর পরামর্শ করি ;
কি আছে দেবের মনে জানি না বিশেষ !"

(৪৬)

শুনি সেই বার্ত্তা, শত ঋষির কুমার
দাঁড়াইল আসি গ্রামপতির নিকটে ;
কহিল:—"গ্রামের ধন রত্ন কিবা ছার—
সঁপিতে কুণ্ঠিত যাহা হইব সঙ্কটে।

(৪৭)

"এখনি সমর সজ্জা করি দলেবলে
যাইতাম দস্যুগণে করিতে সংহার ;
কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট তারা, কি হবে বিফলে
শূন্য বায়ুমাঝে অসি করিয়া প্রহার :

(৪৮)

"প্রাণ দিয়ে যে রমণী করিতে উদ্ধার
ছিলাম প্রস্তুত মোরা ; করি অর্থ দান
মোচন করিতে আর এখন কাহার
হইবে আপত্তি বৃথা, গণি অপমান ?

(৪৯)

"সতীর উদ্ধার তরে এই অপমান
নিরুপায়ে যদি মোরা না সহি এখন,
হবে কি সে আর্য্যোচিত ? কিসের সম্মান,
কলঙ্কিত হয় যদি সতীর জীবন ?

(৫০)

"এ গ্রামের তুমি পতি, পিতা সবাকার ;—
তোমারি সম্মানে সুখে সুখী মোরা ;—তবে
ক্ষালিতে কলঙ্ক এবে, কি আছে ধরার—
যাহা না করিবে দান, গ্রামবাসী সবে ?"

(৫১)

সাধু সাধু করি সবে উঠিল চৌদিকে—
"কিন্তু এ সাহস কিগো হইবে উচিত ;
বিশ্বাস করিয়া ধূর্ত্ত অসুর অরিকে,
যাবে কি কুমার ?" চিন্তা হইল উদিত।

(৫২)

"তোমার কি অভিমতি পুত্র প্রিয়তম ?"
জিজ্ঞাসিলা গ্রামপতি। কুমার তাঁহার
অমনি কহিল উঠিঃ—"স্বামীর ধরম
সুখে দুঃখে সমভাগী হইবে দারার।

(৫৩)

"যাইব একাকী বন পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া—
যা' করিবে দস্যুদল করুক আমার.
যায় যাবে তুচ্ছ প্রাণ কর্ত্তব্য সেবিয়া ;—
আর্য্যের সম্বল, কৃপাদৃষ্টি দেবতার।"

(৫৪)

শুনি কহে গ্রামপতি সুগম্ভীর স্বরে,
"যাইবে কুমার স্থির, বুঝিনু কথায় ;
মাস ব্যাপী হবে যজ্ঞ বিদায়ের তরে।
দেব আশীর্ব্বাদ বিনা সিদ্ধি বা কোথায় ?"

(৫৫)

মন্ত্রণা করিয়া স্থির গেল সবে ঘরে,
আরম্ভিলা মাস ব্যাপী যজ্ঞ অতঃপর.
কবে যজ্ঞ হবে শেষ ভাবিয়া অন্তরে
" পত্নী সুবৎসল, দিন গণে নিরন্তর।

(৫৬)

মাসান্তে সে যজ্ঞ অন্তে যবে গ্রামপতি
'স্বাহা' বলি শেষাহুতি দিল হুতাশনে,
জ্বলিল না অগ্নিশিখা। 'একিরে নিয়তি'
ভাবিয়া উঠিল কাঁপি ঋষি সেইক্ষণে।

(৫৭)

'সচন্দ্রা স্বস্তয়ে' বলি আহুতি আবার
প্রদানিলা ঋষিবর; জ্বলিল অনল.
বাজিল মঙ্গল বাদ্য; উঠিল কুমার
লভিবারে দেবাশীষ হইয়ে চঞ্চল।

(৫৮)

অপাংশুল যজ্ঞ পাংশু প্রদানি ললাটে,
আশীষিয়া পতি পত্নী কুমারে তখন,
কহিলা—"দেখিও বাছা এ ঘোর বিভ্রাটে
ইষ্ট দেবতার নাম ভুলো না কখন।

(৫৯)

"যাও বৎস নিরাপদে আনিতে কান্তারে.
তুমি বীর, আর্য্যকুলে নয়নরঞ্জন।"
সাশ্রু নেত্রে তারপর নেহারি কুমারে
চুম্বিয়া ললাটদেশ দিল আলিঙ্গন।

(৬০)

বন্দিয়া দেবতাগণে বন্দি বাপ মায়,
অস্ত্র, অশ্ব, গাভী লয়ে বর্ব্বরের তরে,
উত্ত্যক্ত হইল যুবা যাইতে ত্বরায়,
বার বার ইষ্ট নাম স্মরিয়ে অন্তরে।

(৬১)

আশ্বাসিয়ে বাপ মায় আশার কথায়,
তুষি প্রিয় সম্ভাষণে সহচরগণে,
উদ্বিগ্ন হৃদয়ে যুবা লইল বিদায়,
করিলা মঙ্গলাচার গ্রামবাসী জনে।

বিন্ধ্যবাসিনী।

উত্তরভাগ।

(১)

দুর্ভেদ্য পর্ব্বতমালা বেষ্টি চারিদিকে,
　　সুচ্ছায় কাননতরু শোভে গায় গায় :
বৃত্তাকারে গড়খাই খোদিত অন্তিকে,
　　মধ্যে পুরী ; দস্যুরাজ বিরাজে যথায়।

(২)

বিস্তীর্ণ চত্বর ভূমি—রাজ দরবার,
　　বসি সেথা কৃষ্ণ দস্যু প্রসন্ন আননে,
করিছে মন্ত্রণা কিম্বা ব্যবস্থা বিচার,
　　বেষ্টিত হইয়া যত অনুচরগণে।

* যে অনার্য্যদিগকে পরাভূত করিয়া, আর্য্যজাতি এদেশে রাজ্যস্থাপন করেন, তাহারা বর্ব্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইলেও, তাহাদিগের যে গড ছিল, নগরী ছিল, ঋগ্বেদেও তাহার উল্লেখ আছে। যে হিসাবে ইংরাজের দৃষ্টিতে আমরা বর্ব্বর, তাহারাও সেইরূপ বর্ব্বর ছিলনাত ?

(৩)

কহে দস্যুপতি—"এই ঋষির কুমার
দুই মাস অবস্থান করিয়া হেথায়,
শিখায়েছে আর্য্যদের অস্ত্র ব্যবহার ;
উপযুক্ত প্রতিদান কি করি উহায় ?

(৪)

"যার তরে আসিয়াছে এখনো তাহায়,
পায়নি নিকটে যুবা করিতে দর্শন .
না জানি নিষ্ঠুর কত ভেবেছে আমায় !
আজি তারে ওর করে করিব অর্পণ ।

(৫)

"দিব শত গজদন্ত উজ্জ্বল প্রস্তর,
মনে করে আর্য্যজাতি বহুমূল্য যারে,
সতত করিব রক্ষা এদের নগর,
আচরিব পরস্পরে মিত্র ব্যবহারে ।

(৬)

"নিশি শেষে পতি পত্নী ফিরে যাবে ঘরে,
সঙ্গে যাবে একশত যোগ্য অনুচর ।
করি সবে মদ্য পান আনন্দ অন্তরে
বিদায় উৎসবে মত্ত কর এ নগর ।"

(৭)

'জয় জয়' রবে সভা করিয়া কম্পিত
বর্ব্বরের অনুচর করে মদ্যপান ;
আত্ম কীর্ত্তিময় যত সমর সঙ্গীত
বেষ্টি ঋষিপুত্রে তারা করে সবে গান ।

চারিদিকে কোলাহল মধ্যে যুবা ঋষি,
সাশ্রুনেত্রে ধ্যায় আর্য্য দেবের মহিমা ;
গণিছে, কখন দিবা অন্ত আসে নিশি ;
হেরিবে নখন তার প্রাণের প্রতিমা ।

(৯)

ক্রমে দিবা অবসান ; রবির কিরণ
গিরিশিরে মেঘস্তরে নানা বর্ণে ভরা
রচে গিরি শত্ত শত ; শোভিল কানন
উজ্জ্বল কমলা বর্ণে, রম্য চারু ধরা ।

(১০)

অসংখ্য বিহঙ্গ কণ্ঠে উঠিল সঙ্গীত,
ছাইয়ে কানন স্থল, ছাইয়ে গগন ;
বিপুল কানন ভূমে মৃদুল ললিত—
বহিল অনন্দে স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণ ।

(১১)

থামিল উৎসব গীতি আদেশে রাজার ;
ভঙ্গ হল দরবার। একাকী তখন
বসিলেন ঋষিপুত্র নিকটে তাঁহার ;
হইল উভয়ে কত প্রীতি আলাপন।

(১২)

কহে রাজা—"শুন শুন হে ঋষিকুমার,
অচ্ছেদ্য মিত্রতা পাশে মোদের অন্তর
বদ্ধ হল আজি হতে ; বিপদে তোমার—
জানিও সহায় আমি রব নিরন্তর।

(১৩)

"স্পর্শে নাই দেহ কেহ তব রমণীর ;
চল তার গৃহে আজি।" শুনিয়া তাহার
পুলকে উঠিল কাঁপি সমগ্র শরীর,
সাশ্রুনেত্রে ধন্যবাদ করিলা অপার।

* * * * *

(১৪)

জ্যোছনা প্লাবিত নিশি, স্তব্ধ দ্বিপ্রহর ;
নিস্তব্ধ কানন গিরি ভূতল গগন ;
নিস্তব্ধ নিদ্রার কোলে যতেক বর্ব্বর,
রাজপুরে নিদ্রাশূন্য শুধু দুইজন।

(১৫)

সম্ভাষি পতিরে, পত্নী কহে মৃদুস্বরে—
"দুই পত্নী আছে এই বর্ব্বর রাজার ;
কনিষ্ঠা সতত হেথা অনুরাগ ভরে
লইত অশেষ তত্ত্ব বন্দিনী আমার।

(১৬)

"অতীব নির্দ্দয় জ্যেষ্ঠা, জানিল যখন
আসে সে আমার পাশে সান্ত্বনিতে চিত,
নিষেধ করিল তারে করিয়া তর্জ্জন,
বন্দীসহ সদালাপ ভাবি অনুচিত।

(১৭)

"তবুও গোপনে নিত্য আসিত, বসিত ;
ভুলিতাম নির্জ্জনতা তাহার কৃপায়,
মর্ম্মে মর্ম্মে স্মৃতি তার রহিল গ্রথিত,
একবার তারে প্রাণ দেখিবারে চায়।

(১৮)

প্রত্যূষে করিব যাত্রা ; তখন তাহায়
পাব না দেখিতে ; তাই নিশীথে এখন
যাইব তাহার পাশে মাগিতে বিদায়,
আছে যথা একাকিনী করিয়া শয়ন ?

(১৯)

"আজি নিশি একাকিনী আপনার ঘরে,
প্রতীক্ষিয়া রবে মোরে বলেছে গোপনে ;
বিশেষ, আছেন রাজা বাহির চত্বরে ;
পূর্ণিমায় এই রীতি বর্ব্বর ভবনে।"

(২০)

কৃতজ্ঞতা পূর্ণ চিত, আর্য্যের নন্দন,
শুনিয়া সন্তুষ্ট চিতে দিলেক সম্মতি ;
বাহিরিলা পত্নী একা তেজিয়া শয়ন ;
অপেক্ষিয়া আগমন রহিলেন পতি।

(২১)

চাহিয়া পশ্চাতে, আর চাহি চারি ভিতে,
এলো কেশে এলো বেশে মৃদুপাদে নারী,
বাহির চত্বর মুখে উদ্বেলিত চিতে
চলিলা। পাপিষ্ঠা কিরে আর্য্যের কুমারী ?

(২২)

অন্তঃপুরে যাবে বলি স্বামীরে ছলিয়া,
রাজার শয়ন ঘরে যায় আর্য্যনারী ;
ছি ছি, কলঙ্কের কথা কি হবে বলিয়া ?
অসার রমণী দেহ শুধু পাপে ভারি।

(২৩)

ঘুমাইছে দস্যুপতি গভীর নিদ্রায়,
বিশাল উরস আর কপোল ছাপিয়া,
বিলম্বিত কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ শোভা পায়
স্ফুট শুভ্র চন্দ্রালোক অঙ্গেতে মাখিয়া।

(২৪)

যৌবনের দীপ্ত শ্যাম বর্ণ সমুজ্জ্বল
ভাতিছে ললাটে মুখে জ্যোছনা-প্লাবিত ;
বহিছে গভীর শ্বাস সম অচঞ্চল,
পূর্ণ স্বাস্থ্য, দীর্ঘ আয়ুঃ করিয়ে সূচিত।

(২৫)

নিঃশব্দে শয্যার পাশে বসিয়া তখন
পরশিয়া অঙ্গ, বালা, ডাকে মৃদুস্বরে ;—
চমকিয়া দস্যুপতি মেলিয়া নয়ন
দেখিল আর্য্যের পত্নী বিস্মিত অন্তরে।

(২৬)

"কি চাও ললনা তুমি ? কেন এ নিশিতে
আসিয়াছ একাকিনী নিকটে আমার ?
এসেছ বা পতি সঙ্গে গোপনে কহিতে,
বলিতে পারনি যাহা সাক্ষাতে সবার ?

(২৭)

"সুজন সুন্দর বীর তব প্রিয়পতি,
বহু উপকারে বাধ্য করেছেন মোরে :
যা চাহিবে তাঁর তরে দিব তাহা সতী,
হইয়াছি বদ্ধ মোরা মিত্রতার ডোরে।

(২৮)

"কহগো নির্ভয়ে তুমি খুলিয়া পরাণ,
ভুলি যত পূর্ব্বকৃত মন্দ আচরণ,
দস্যু বটে, তবু পরনারীর সম্মান
করিতে কুণ্ঠিত মোরা নহি কদাচন।"

(২৯)

"কি কহিব দস্যুপতি," কহে আর্য্যবালা :
"প্রভাতে বিদায় লবে বন্দিনী রমণী,
"কিন্তু চিরদিন তার অন্তরের জ্বালা—"
কহিতে কহিতে কথা, থামিল অমনি।

(৩০)

শুভ্র ক্ষুদ্র দন্তে দংশে ফুল্ল বিম্বাধর,
নয়নে মোহিনী জ্যোতি চাপিল পাতায়,
গণ্ডে রক্ত রেখা ভাসে সুগভীরতর,
তরল লাবণ্য ছেয়ে জ্যোছনা খেলায়।

(৩১)

"মরি কি সুন্দর মূর্ত্তি!" ভাবে দস্যুপতি ;
অনুভবে যাহা মনে হতেছে উদিত
সম্ভবে কি কভু তাহা? কভু আর্য্য সতী
শুনিনিত কলঙ্কিনী পাপ-মগ্ন চিত!"

(৩২)

প্রকাশে কহিল দস্যু "বুঝিতে না পারি
কি কামনা করি মনে আসিয়াছ হেথায়
জানে যদি পতি তব, একা তুমি নারী
এসেছ আমার পাশে, মরিবে লজ্জায়।"

(৩৩)

কহে পাপীয়সীঃ "এই হৃদয় আমার—
তোমারে করেছি মনে মনে সমর্পণ,
সাধ নাই আর্য্য পুরে ফিরিব আবার ;
হউক আমার নামে কলঙ্ক রটন।

(৩৪)

"আর্য্যের কঠোর বিধি ইন্দ্রিয় দমন,
ব্রহ্মচর্য্য,—তৃপ্তি তাহে হয় না আমার
উদ্দাম স্বাধীন এই বর্ব্বর জীবন,
নৃত্য গীত, মদ্যপান, ইচ্ছি ভুঞ্জিবার।"

(৩৫)

"সুন্দর আমার স্বামী, কিন্তু মুখে তাঁর
কামনা লালসা মাখা হাসি রাশি নাই ;
শুধুই বৈদিক নিষ্ঠা শুদ্ধ সদাচার,
নিয়মিত হাসি, কথা,—আমি নাহি চাই।

(৩৬)

"কি বলিব দস্যুপতি, প্রাণপতি তুমি ;
তোমারে পাইলে হবে বাসনা পূরণ ;
স্পর্শিব না এই পদে শুষ্ক আর্য্য ভূমি,
তুমি লও, এই মোর জীবন যৌবন।"

(৩৭)

কি বলে বিদায় করি স্বামীকে তোমার ?
বহু উপকারে তাঁর ঋণী মোরা সবে ;
কিরূপে বলনা ভঙ্গ করি অঙ্গীকার,
সত্যপ্রিয় বলি মোর গর্ব্ব কোথা রবে ?

(৩৮)

"নিষ্ফল প্রার্থনা তব ; ফিরে যাও ঘরে।
কি কর কি কর বালা ? স্পর্শিওনা আর
জেনো স্থির, তুচ্ছ এক রমণীর তরে
দিবনা হইতে প্রাণে কলঙ্ক সঞ্চার।

(৩৯)

উঠিল সে পাপীয়সী, গেল বেগভরে।
যদিও জীবন্তে মৃত হইল পরাণ।
একাকী তথন দস্যু বিস্তীর্ণ চত্বরে--
চিন্তায় হইয়ে মগ্ন রহিল শয়ান।

(৪০)

দ্বিতীয় প্রহর দিবা ; সূর্য্যের কিরণ
ঝলসিছে ঘনন্যস্ত বৃক্ষের পাতায় ;
তপ্ত নগ্নশৈল করে অগ্নি উদ্গীরণ,
লুকাইছে পশু পক্ষী নিবিড় ছায়ায়।

(৪১)

এই যেন স্পর্শে দেহ সমীর শীতল,
অগ্নির ঝলকে পুনঃ যায় শুকাইয়া ;
যেন বহ্নি খুঁজি, খুঁজি ঘন ছায়াতল
দহে সমীরণে যে বা থাকে লুকাইয়া।

(৪২)

ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত পদে এ হেন সময়,
আর্য্য পতি-পত্নী, শত বর্ব্বরের সাথে
উপনীত হল, যথা শৈল গুহা দ্বয়
ছায়াময়, পরিপূর্ণ সুশীতল বাতে।

(৪৩)

লভিতে বিশ্রাম সবে দক্ষিণ গহ্বরে
প্রবেশিল ধীরে ধীরে ; মধ্যভাগে যার,
বিকট রমণী মূর্ত্তি খোদিত প্রস্তরে,.
রাজ্য রক্ষা কর্ত্রী যিনি বর্ব্বর রাজার।

(৪৪)

আচম্বিতে উঠে শব্দ ধীর ভয়ঙ্কর—
"অসতী রমণী হেথা প্রবেশিতে নারে"—
সভয়ে কাঁপিল আর্য্য নারীর অন্তর,
ভয়শুষ্ক মুখ তাব সবাই নেহারে।

(৪৫)

"সতী অসতীর এই পরীক্ষার স্থল"—
আবার উঠিল শব্দ ধ্বনিয়া গহ্বর :
"অসতী স্পর্শিলে এই দেবী পীঠতল,
মরিয়া হইবে এই শিলার প্রস্তর।"

(৪৬)

সন্দেহ উপজে সদা গভীর প্রণয়ে ;
ভাবে ঋষি ;—"কি বিশ্বাস বর্ব্বর কথায় ?
কি জানি কি ঘটিয়াছে রাজার আলয়ে—
মীমাংসা করিব তাহা দৈব পরীক্ষায়।

(৪৭)

"অনার্য্য জাতির এই দেবতা—প্রস্তর ;
বিশ্বাস করি না তায় ; কিন্তু পত্নী লয়ে
না করি পরীক্ষা যদি, ভাবিবে বর্ব্বর,
অসতী লইয়া ঋষি ফিরে গেল ভয়ে।

(৪৮)

কহিলা প্রকাশে—"প্রিয়ে নিঃশঙ্কে এখনি
কর স্পর্শ পীঠতল নিষ্কলঙ্ক তুমি ;
সতী পতিব্রতা নিত্য আর্য্যের রমণী,
সাক্ষ্য দিবে এ কথার অনার্য্যের ভূমি।"

(৪৯)

স্রোতঃ রূপে বহে ঘর্ম্ম ; অসাড় শরীর,
বক্ষের ধমনী শিরা হইল নিশ্চল ;
লুটাইয়া পীঠতলে আর্য্য রমণীর
পড়ে মৃত দেহ-লতা কলঙ্কি ভূতল।

(৫০)

বিস্ময়ে বর্ব্বর যত চাহে দেবী পানে ;
বিস্ময়ে মুদিল চক্ষু আর্য্যের কুমার,
হেন কালে অলক্ষিতে মৃদুল আহ্বানে
'মিত্র' বলি পার্শ্বে কেহ ডাকিল এবার।

(৫১)

চাহিল ঋষির পুত্র, চাহিল বর্ব্বর ;
চেয়ে দেখে দস্যুপতি উপস্থিত তথা ।
সম্ভ্রমে সকলে দূরে হইল অন্তর ;
দুজনা বসিয়ে তারা কহে কত কথা ।

(৫২)

পত্নীর কলঙ্ক কথা কহি বিশেষিয়া -
প্রশংসিল মাহাত্ম্য সে আত্ম দেবতার ;
কহিল -যাওগো যুবা দেশেতে ফিরিয়া,
হইয়াছে উপযুক্ত এ দৈব বিচার ।

(১৮৯৩

চক্রতীর্থ বা ছিরিপরিচার

(১)

সুলিয়া নামেতে জাতি তৈলঙ্গী ধীবর

পুরীর সমুদ্র-তটে বাস ;

সাগরে ভাসায়ে ডিঙ্গি, নির্ভীক অন্তর,

মাছ ধরে সুখে বারমাস।

(২)

ভীমনাদে সিন্ধু যবে করে গরজন

মেরুসম তরঙ্গ তুলিয়া,

তখনো তাহার বক্ষে করে সন্তরণ,

ওঠে পড়ে দুলিয়া দুলিয়া।

(৩)

চির পরিচিত সিন্ধু সেই বাড়ীঘর,

সেই নিত্য ব্যবসার স্থল ;

বড় ভাল বাসে তারা তাই সে সাগর,

ভাবে তারে সহায় সম্বল।

(৪)

ডোঙ্গরের এক ছেলে নাম পরিচারং;
প্রতিবেশী তাহার চন্দর,
তার এক ছোট মেয়ে ছিরি নাম তার,
ছেলে মেয়ে খেলে একত্তর ।

(৫)

বালক বালিকা দুটি সাগরের কূলে,
নিত্য আসে নিত্য করে খেলা ।
কি যে দেখে কি যে খেলে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে,
গৃহে যেতে নিত্য বাড়ে বেলা ।

(৬)

পোহাইয়া আসে রাত্তি, যায় যায় তমঃ,
বেলাভূমে আসিয়া দাঁড়ায় ;
কষিত কাঞ্চন রাগে মরকত সম
উষা রাগে সিন্ধু শোভা পায় ।

(৭)

"ওই ওঠে, ওই ওঠে" বলিতে বলিতে
সিন্ধু গর্ভ হইতে তখন,
তরঙ্গে তরঙ্গে যেন জ্বলিতে জ্বলিতে—
মাথা তোলে বালক তপন ।

(৮)

ঘুমভাঙ্গা কচিমুখে স্নিগ্ধ রবিকরে,
কি যে শোভা উঠিত ফুটিয়া,
কি যে গান গেয়ে যেত কি যে মৃদু স্বরে,
মাধুরী সে পড়িত লুটিয়া।

(৯)

বাড়ে বেলা, ডাকে সিন্ধু, আসে গরজিয়া ;
কূলে কূলে আছাড়িয়া পড়ে ;
যায় দ্রুত কুল ভূমি তখনি তেজিয়া—
ফেরে পুনঃ আনন্দ অন্তরে।

(১০)

তরঙ্গ গড়ায়ে যায়, ধেয়ে যায় সাথে ;
ওই ওই আসিল বলিয়া
ছোটে পুনঃ কুল পথে, ধরি হাতে হাতে ;
পড়ে কভু তরঙ্গে ঢলিয়া।

(১১)

শামুক ঝিনুক কত কুড়াইয়া আনে,
যেন সে কি অমূল্য রতন ;
হাসে, খেলে, গান গায়, দোঁহে একতানে
দু'জনার মনের মতন।

(১২)

বাড়িল বয়স ; তবু খেলে দুইজনে
ছুটে ছুটে সাগর বেলায় ;
কিন্তু কি হয়েছে যেন, ভাবে মনে মনে ;
তবু দোঁহে আনন্দে খেলায়।

(১৩)

বালিকা সাগর পানে থাকে তাকাইয়া,
বালক নেহারে মুখ তার ;
কি ছার অরুণ কান্তি ? তনু ছাপাইয়া—
যে তরঙ্গ খেলে অনিবার !

(১৪)

বালকের মৃদু গান, বালিকার কাণে
কি যে মধু কি যে স্বপ্ন ঢালে ;
ভুলি সিন্ধু গরজন, শোনে মুগ্ধ প্রাণে ;
বুক যেন নাচে তালে তালে।

(১৫)

ছুঁতে গেলে হাতখানি হাত যেন কাঁপে,
অঙ্গুলি-পরশে কাঁপে হিয়া ;
কহিতে কহিতে কথা মুখ যেন চাপে ;
কি পশিল পরাণে আসিয়া ?

(১৬)

দাঁড়াইয়ে কূলে তারা ; সান্ধ্য সমীরণ
মৃদু বীচি তুলিছে সাগরে ;
দাঁড়ায়ে দুজনা তারা করিছে দর্শন
সেই দৃশ্য প্রফুল্ল অন্তরে।

* * * *

(১৭)

মৃদুল মৃদুল বহে সমীরণ
ঈষৎ তরঙ্গ সাগরে তুলি,
ঝরিয়া ঝরিয়া চাঁদের কিরণ
পড়িয়া জ্বলিছে সে বুকে দুলি ;

(১৮)

ঈষৎ চঞ্চল সোহাগ পরশে,
ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গ ধায় ;
নব প্রেমরসে যেন রে হরষে,
লাজে ভয়ে নব কিশোরী চায়।

(১৯)

নাচিয়া সমীর যায় আগে আগে,
আদরে সাপটি তরঙ্গ বালা ;
আধ লাজভরে আধ অনুরাগে,
জড়িত চরণে চলে বিহ্বলা।

(২০)

কহিতে যেন রে সরে না বচন,
তবুও যেন না কহিলে নয়,
কহিছে, "আমার চলে না চরণ";
অমনি সমীর মৃদুল বয়।

(২১)

পিয়াস, তরঙ্গ-অধর-আসবে,
আগ্রহে সমীর করিবে পান ;
করিছে কামনা, বহিছে নীরবে ;
ফুটিয়া কহিতে সরেনা প্রাণ।

(২২)

বালিকার বুকে প্রেমের অঙ্কুর,
আছে কি না আছে তাহার তরে,
বুকেতে চাপিয়া সে দেহ মধুর
জানিতে সমীর বাসনা করে।

(২৩)

ছুটিয়া ছুটিয়া আবেগে ভরিয়া,
বেড়িয়া বেড়িয়া চলিয়া যায় ;
সরমের দায়ে সাহস করিয়া
পারেনা কামনা পূরাতে হায় !

* * * *

(২৪)

কতই বাসনা নিত্য হৃদয় মথিত,
শোভা যবে ছাইত ভুবন ;
ধীরে ধীরে কিন্তু দিন হইল অতীত,
ধীরে ধীরে বাড়িল জীবন।

(২৫)

দু'জনে বিজনে আর সাজেনাকো খেলা,
লোকলাজ বিষম এমনি ;
আসে পরিচার, দেখে শূন্য পড়ি বেলা ;
কেন হায় বাড়িল জীবন !

(২৬)

পরিচার যায় দূরে তরি ভাসাইয়া,
সাগর ছেঁচিয়া মাছ ধরে ;
একাকিনী থাকে ছিরি কূলে দাঁড়াইয়া,
সদা প্রাণ আন্‌চান্‌ করে।

(২৭)

গৃহকাজে মন তার বসেনাকো আর,
চেয়ে থাকে সাগরের পানে ;
"ওই বুঝি ওই বুঝি এল পরিচার"
থাকে ছিরি সদা সেই ধ্যানে।

(২৮)

কিছুদিনে বাপ মায় পাইল ঈঙ্গিত,
কহে কথা ডোঙ্গরের কাছে ;
বলে তুমি কর এবে যা' হয় বিহিত,
শুভ কাজে বিলম্ব না সাজে।

(২৯)

কাহার আপত্তি তাহে ? স্থির হলো বিয়ে,
সমারোহ ঝুলিয়া পাড়ায় ;
আনন্দে লুকাল ছিরি গৃহকোণে গিয়ে,
বেলাভূমে আর না দাঁড়ায়।

* * * *

(৩০)

একদা প্রভাত কালে আসি পরিচার,
খেলাচ্ছলে ভাসাইল তরি ;
ভাবিল, ফিরিব কুলে এখনি আবার ;
স্থির সিন্ধু, আমি কিগো ডরি ?

(৩১)

প্রফুল্ল প্রভাত মৃদু বহে সমীরণ,
প্রসন্ন গগন সিন্ধুতল ;
ওঠে পড়ে ঢেউ বটে ; কিন্তু গরজন
তত যেন নহেক প্রবল।

(৩২)

নবীন ভানুর করে তরঙ্গের গায়
লক্ষ তারা ফুটিয়া জ্বলিছে ;
নবীন উৎসাহ ভরা বইঠার ঘায়,
তরিখানি ছুটিয়া চলিছে।

(৩৩)

যতদূর যায় দৃষ্টি, গেল পরিচার ;
তবুও না ফিরাল তরণী ;
আরো গেল, আরো গেল ;—অলক্ষ্য এবার !
নবোৎসাহ নির্ভীক এমনি।

(৩৪)

অনন্ত সিন্ধুর রাজ্য, কোথা গেল ভেসে ?
কোথা গিয়া ডুবিয়া মরিবে ?
ভাবিয়া সবাই কূলে দাঁড়াইল এসে ;
কতক্ষণে কেমনে ফিরিবে।

(৩৫)

মলিন বিষাদ মুখে দাঁড়াইয়া ছিরি,
সচকিতে চাহে চারিধার ;
সুদূরে দেখিয়া ঢেউ, ভাবে, ওই ফিরি—
আসিছে বা পরিচার তার।

(৩৬)

দেখিতে দেখিতে বেলা গড়াইয়া যায়,
কই তরি, আসেনাকো আর ;
হাহাকার পড়ে গেল নুলিয়া পাড়ায়,
বাপ মায় করিছে চীৎকার।

(৩৭)

তরি নিয়ে ছুটাছুটি করে চারি ভিতে ;
কিন্তু সিন্ধু, সে যে গো অশেষ !
গেল দিন এলো সন্ধ্যা দেখিতে দেখিতে,
কেহ কোথা না পায় উদ্দেশ।

(৩৮)

গেল সন্ধ্যা, গেল রাতি, চাহিয়া ভাবিয়া,
কিন্তু নাহি এল পরিচার :
নিশ্চয় হইল স্থির, মরেছে ডুবিয়া,
বৃথা খুঁজে কি হইবে আর ?

(৩৯)

যে যাহার গেল ঘরে আত্মীয় স্বজন,
যে যার আপন কাজ করে ;
শোকে মগ্ন পিতা মাতা করিল রোদন,
বহুদিন তনয়ের তরে।

(৪০)

সময়ের স্নিগ্ধ শ্বাসে শোকের উত্তাপ
দিনে দিনে আসিল কমিয়া ;
মাঝে মাঝে পড়ে মনে, করে বা বিলাপ ;
ধীরে শোক এল প্রশমিয়া ।

(৪১)

কিন্তু সে বালিকা, তার বুকের আগুন
কিছুতেই নিবিবার নয় ;
নিত্য ভাবে এ কি তার ভাগ্য নিদারুণ,
নিত্য নব যাতনা উদয় ।

(৪২)

যখনি সময় পায়, যায় সিন্ধুকূলে,
থাকে শুধু সুদূরে চাহিয়া ;
দৃশ্যে দৃশ্যে কত কথা জাগে চিন্তামূলে,
কত স্মৃতি আসেরে বহিয়া ।

(৪৩)

অনন্ত শোকের সিন্ধু ছেয়ে ক্ষুদ্র বুক,
শেষ নাই জীবনে মরণে ;
তুলনায় এ সাগর বল কত টুক্ ?
সীমা যার মেরুর চরণে ?

(৪৪)

একদিন সন্ধ্যাবেলা, আহা অনাথিনী,
একাকিনী বসি বেলাভূমে
চিন্তায় অবশ চিত্ত হোয়ে বিষাদিনী
ঢলিয়া পড়িল ঘোর ঘুমে।

(৪৫)

চরণের তলে সিন্ধু করে গরজন
যেন তার বিষাদে কাঁদিয়া ;
চাঁদ যেন আজি হেথা দেখিয়া বিজন
তোষে তারে স্নিগ্ধ কর দিয়া।

(৪৬)

ঘুমঘোরে হেরে বালা অদ্ভুত স্বপন ,
তাহার প্রাণের পরিচার,
বহুদিন যেন কোথা করিয়া যাপন,
ফিরে যেন আসিল আবার।

(৪৭)

"কেন পড়ি একাকিনী বল বেলাভূমে ?"
এসে যেন কহিল তখন ;
"আমি আসিয়াছি, তুমি রহিবে কি ঘুমে ?
ওঠ ছিরি হৃদয় রতন !"

(৪৮)

চমকি উঠিল ছিরি মেলিল নয়ন,
দেখে চেয়ে একি চমৎকার !
আসিতেছে প্রেমভরে দিতে আলিঙ্গন
তাহার প্রাণের পরিচার।

(৪৯)

দুরু দুরু কাপে বুক উঠিতে না পারে
মোহবশে পড়িল ধরায় ;
মূর্চ্ছা ভঙ্গে দেখে পুনঃ বুকে ধরি তারে
পরিচার বসিয়ে তথায়।

(৫০)

তবুও প্রত্যয় যেন মানে না পরাণ
ফিরে ফিরে মুখ পানে চায় ;
কি যেন কহিবে কথা করিছে সন্ধান,
কিন্তু কথা কিছু না জুয়ায়।

(৫১)

আদরে সাপটি বুকে কহে পরিচার,
"শুন ছিরি, শুন স্থির চিতে,
কোথা ছিনু এতদিন, কেমনে আবার,
ফিরে এনু আজি এ নিশীথে।

(৫২)

জান ত গো সেই দিন তরি ভাসাইয়া
গিয়াছিনু বহুদূরে চলি ;
ফিরাতে চাহিনু তরি, কিন্তু কে আসিয়া,
জোর করি ধরিল শিকলি।

(৫৩)

বিস্তীর্ণ সাগর বক্ষ, কেহ কোথা নাই,
কে আসিল কে ধরিল বলে ?
খুঁজি খুঁজি চারিভিতে দেখিতে না পাই,
কি বাঁধিল তরির শৃঙ্খলে।

(৫৪)

সহসা সাগর-গর্ভ আলোকে উজলি
বিস্তারি সোপান ঊর্ম্মিশিরে,
হেরিনু ষোড়শী এক রূপের পুতলি,
উঠি পাশে এলো ধীরে ধীরে।

(৫৫)

কি কহিল কি বলিল ধরি চারুকরে,
কাণে তাহা পশেনিকো ভাল ;
আমি সুধু হেরেছিনু বিস্মিত অন্তরে
সে মাধুরী, সে রূপের আলো।

(৫৬)

কি যেন মোহিনী শক্তি, কি যেন জড়তা,
তাই দিয়ে বাঁধিল আমায় ;
কি যেন কহিতে গিয়ে ভুলে গেনু কথা,
যা কহিল তাহে দিনু সায়।

(৫৭)

সাগরের গর্ভে ছিরি, সিঁড়ি পথ দিয়া,
—যথা পুরী অপূর্ব্ব নির্ম্মিত—
ধীরে ধীরে দুইজন নামিলাম গিয়া,
দেখে বড় হইনু বিস্মিত।

(৫৮)

সাগর স্তম্ভিয়া তার গরভে রচিত
দিব্য পুরী, এ পুরী কি ছার !
মাণিক্য মুকুতা দিয়ে প্রাসাদ জড়িত,
তিলমাত্র নাহি অন্ধকার।

(৫৯)

শুধুই রমণী তথা করে ছিরি বাস,
রাজা প্রজা কিছু ভেদ নাই ;
সদা তারা পরস্পর করে পরিহাস,
বিসম্বাদ নাহি সেই ঠাঁই।

(৬০)

তরি আরোহণে যদি কভু সেই স্থানে,
পুরুষ কাহাকে তারা পায়,
অমনি যাহারে খুসী, গিয়ে তারে আনে,
ধরে রাখে প্রেমের মায়ায়।

(৬১)

কত যে যতন করে না পারি কহিতে ;
প্রেমালাপে মগন সদাই ;
সে যেন কেমন প্রেম পারি না সহিতে,
কিছুদিনে ঠেকিল বালাই।

(৬২)

অত হাসি, অত রঙ্গ, অত আলো রাশি,
বড়ই কর্কশ লাগে ছিরি ;
ভাবিতাম, কত দিনে যাহা ভালবাসি,
বিধাতা দেবে গো মোরে ফিরি।

(৬৩)

কাঁদিয়া চরণতলে পড়িনু তাহার ;
যাচিলাম দিতে গো বিদায়,
হাসিয়া বিদ্রূপ হাসি কহিল ; "তোমার
কি অভাব বলনা হেথায় ?

(৬৪)

"এমন সুরম্য পুরী, পাবে কি কখন ?
কোথা পাবে এত সমাদর ?
মাছ ধরে দুঃখে অন্ন কর উপার্জ্জন,
"তাই চাও ? এতই বর্ব্বর ?

(৬৫)

"এ রূপ-যৌবন মোর ভাল নাহি লাগে ?
পায়ে ঠেলে কে বল রতনে ?
"কুরূপার কালরূপ তাই মনে জাগে ?
ছিছি লজ্জা হয় নাকো মনে ?

(৬৬)

ভয়ে ভয়ে অতি ধীরে করিনু উত্তর,
সত্য যাহা কহিলাম তাই ;
"মাছ ধরি, সুখে খাই, সুখে করি ঘর,
পরিশ্রমে আনন্দ সদাই।

(৬৭)

"মানবের দেহ মম, মানবের প্রাণ,
মানবীর প্রেম লাগে ভাল,
তারি তরে সদা মন করে আন্‌চান্‌,
ভালবাসি হোক্ হোক্ কালো।

(৬৮)

"তোমার অনিন্দ্য মূর্ত্তি, লাবণ্য অতুল,
কিন্তু তাহে নাহিক পিয়াস,
মর্ত্তের কুরূপ লাগি হতেছি আকুল,
আজ্ঞা কর যাই নিজ বাস।

(৬৯)

"ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্র লয়ে চাহি ঘর করি,
সাধ নাই এই লোকে থাকি
দেহ আজ্ঞা, চলে যাই ভাসাইয়ে তরি ;
কিবা ফল মোরে হেথা রাখি

(৭০)

"তোমার এ শোভারাশি হেরিলে নয়নে,
বিস্ময় আতঙ্ক, লাগে বড় ;
ফোটেনা প্রণয় তব প্রণয় বচনে,
ত্রস্তে শুধু হই জড় সড়।"

(৭১)

শুনিয়া হাসিয়া বালা কহিল আমায় ;
"যাও তবে যাও সিন্ধু তীরে,
দেখে এস একবার কি সুখ তথায়,
ইচ্ছা হবে আসিবারে ফিরে।

(৭২)

"রহিতে নারিবে সেথা, শুন প্রাণপতি,
সুধু দেখে আসিবে ভবন ;
যদি কেহ রোধে পথ, জেনো সে দুর্ম্মতি
প্রতিফলে লভিবে মরণ ।

(৭৩)

"যার কথা ভাব মনে সেত সিন্ধু-কূলে
ঘুমাইছে বালির শয্যায় ;
কিন্তু যদি হেরি তারে রহ তুমি ভুলে,
প্রমাদ ঘটিবে পায় পায় ।"

(৭৪)

"এত বলি, রাখি হেথা, কোরেছে গমন :
না জানিবা আসিবে কখন ।
আরো এস বক্ষমাঝে হৃদয়ের ধন,
জন্মশোধ করি আলিঙ্গন ।"

(৭৫)

সভয়ে হতাশে বালা ধরে জড়াইয়া,
কহে, "আর কত সব দুখ,"
কার সাধ্য তোমা ধনে লবে ছিনাইয়া ?
বল, কার এত বড় বুক ?"

(৭৬)

বলিয়া জড়ায়ে আরো ধরি বাহুডোরে,
ডেকে বলে "জয় জগন্নাথ,
তোমার এ পুণ্যক্ষেত্রে, কে করিবে মোরে,
সত্য সত্য এমন অনাথ ?"

(৭৭)

হেনকালে আচম্বিতে আসিল সুন্দরী,
মেঘ ছায় গগন ভূতল ;
আতঙ্কে উঠিল কাঁপি বিস্তীর্ণ নগরী,
কাঁপিয়া উঠিল সিন্ধুজল।

(৭৮)

হাসিল বিদ্রূপ ভরে, সাগর সুন্দরী,
পরিচার গণিল বিপদ ;
বলিল, "প্রাণের ছিরি এইবার মরি,
রোধিওনা রোধিওনা পথ।

(৭৯)

আঁধারে তরঙ্গ জ্বলে সিন্ধু আসে তেড়ে,
আঁধারে সে দীপিছে সুন্দরী ;
এলো তারা তুইজনে এই নেবে কেড়ে,
কাঁদে ছিরি পরিচারে ধরি।

(৮০)

কেঁদে বলে "জগন্নাথ, প্রভু চক্রপাণি,
এ বিপদে করগো উদ্ধার,"
ক্রোধে গরজিয়া বালা দীপ্ত হাতখানি,
প্রসারিল ; কাঁদে পরিচার।

(৮১)

দর্পভরে সিন্ধুবালা ধরে পরিচারে,
দর্পে সিন্ধু এলো গরজিয়া ;
"চলিলাম, মরিলাম" বলিয়া কান্তারে
পরিচার পড়ে মূরছিয়া।

(৮২)

"সতীর বক্ষেতে পতি, কার সাধ্য লবে ?"
বলি আরো ধরে আঁকড়িয়া ;
"জয় প্রভু চক্রপাণি" আর এই রবে
ডাকে ছিরি বিপদে পড়িয়া।

(৮৩)

সহসা মন্দিরচূড়া* হইতে ছুটিল
বিষ্ণুচক্র আঁধার বিনাশি ;
সহস্র বিদ্যুৎ যেন গগনে ফুটিল,
চমকি চাহিল পুরীবাসী।

---

*জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুচক্র আছে।

(৮৪)

কোথা সিন্ধু গরজন ? কোথা সিন্ধুবালা ?
পলাইল দুরন্ত আঁধার ;
আবার সে চারু বিশ্ব, চাঁদে হোল আলা,
বেলা ভূমে ছিরি পরিচার।

(৮৫)

আজি ছিরি পরিচার হ'ল সিদ্ধকাম,
যেই বিষ্ণুচক্রের কৃপায়।
ভক্তিভরে ছোঁহে তারে করিয়ে প্রণাম
মহানন্দে গৃহে ফিরে যায়।

(৮৬)

সাবিত্রী সমান এই ছিরির চরিত,
ক'জনা বা জানে এ জগতে ?
পুরীতটে চক্রতীর্থ নামেতে বিদিত
হ'ল সিন্ধু সেই দিন হতে।

১৮৯২

সমাপ্ত।